স্বস্তিকা
৬৭ বর্ষ, ১৭ সংখ্যা।। ২২ ডিসেম্বর - ২০১৪।। ৬ পৌষ - ১৪২১।। website : www.eswastika.com
দাম : দশ টাকা

বিশ্ব হিন্দু পরিষদের ঐতিহাসিক প্রয়োজন

বিশ্ব হিন্দু পরিষদের একাত্মতা যজ্ঞঃ পশুপতি রথের যাত্রা শুরু করিয়েছেন নেপালের মহারাজা ও মহারাণী

জন্মাষ্টমী ও বিশ্ব হিন্দু পরিষদের প্রতিষ্ঠা

বিশ্ব হিন্দু পরিষদের "রামজন্মভূমির উপর আক্রমণের প্রতিবাদ করুন" দেশবাসীর কাছে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের ডাক





বিধ্বস্ত তামিলনাড়ু ও আন্দামানে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের

বছর

"রামজন্মভূমির উপর আক্রমণের প্রতিবাদ করুন" দেশবাসীর কাছে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের ডাক

অযোধ্যার রামজন্মভূমির উপর অবস্থিত অস্থায়ী রামলালার মন্দিরের উপর পাক মদতপুষ্ট জঙ্গিরা গত এই জুলাই ২০০৫ সকাল ৯ টার সময় হামলা চালায়। ধোঁয়া চত্বর লোহার রেলিং দিয়ে ঘেরা। ১৩৬ জন নিরাপত্তা রক্ষী এবং ১৩টি নজরদারী মিনার রয়েছে। নিরাপত্তাকর্মীদের চিন ভিনটি করায় পেরিয়ে তারা ঢোকেত ছুঁড়তে ছুঁড়তে গর্ভগৃহের দিকে ঢুকে পড়ল। এ-কে ৪৭ রাইফেল নিয়ে তারা নির্বিচারে গুলি ছুঁড়েছে, সীতা রসুইয়ের ভিতরে নিরাপত্তারক্ষীদের সঙ্গে দেড় ঘণ্টা ধরে যুদ্ধ হয়েছে। এতে ৬ জন জঙ্গি ও ১ জন মহিলা প্রাণ হারিয়েছে। আহত ৪ জন সি.আর.পি.এফ. জওয়ান।

সন্ত্রাসবাদীদের এই আক্রমণ ভারতের সার্বভৌমত্ব ও ঐতিহ্যের প্রতি চ্যালেঞ্জ। হিন্দুদের আস্থা ও ভাবাবেগের উপর আঘাত করে তাদের মনোবলকে গুঁড়িয়ে দেওয়াই তাদের লক্ষ্য।

পারা দেশে সাড়ে স্থানে শ্রীরাম পাদুকা পূজা শুরু করছে

স্বস্তিকা

।। কলকাতা ও আগরতলা থেকে একযোগে প্রকাশিত বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

৬৭ বর্ষ ১৭ সংখ্যা, ৬ পৌষ, ১৪২১ বঙ্গাব্দ

২২ ডিসেম্বর - ২০১৪, যুগাব্দ - ৫১১৬,

Website : www.eswastika.com



সম্পাদক : বিজয় আঢ্য

সহ সম্পাদক : নবকুমার ভট্টাচার্য, সুকেশ মণ্ডল

প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪

সার্কুলেশন : ৭২৭৮৪১৭৩১৬, ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

অফিস : ৯৮৭৪০৮০৩৫৪, ৯৮৭৪০৮০৩৪১

বিজ্ঞাপন : ৯৮৭৪০৮০৩৪৩

দাম : ১০ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৪০০ টাকা।

Postal Registration No.-Kol.RMS/48/2013-2015

R N I No. 5257/57

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩ / ৫৯১৫

E-mail : swastika5915@gmail.com

vijoy.adya@gmail.com

Website : www.eswastika.com

স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্টের পক্ষে রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক ২৭/১-বি, বিধান সরণি, কলকাতা - ৬ হতে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাস বোস স্ট্রীট, কলকাতা- ৬ হতে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় ▯ ৫

খোলা চিঠি : আমি মদন বলছি... ▯ সুন্দর মৌলিক ▯ ৭

ওয়ার্ল্ড হিন্দু কংগ্রেসের বার্তা : আগামী দিনে বিশ্বকে পথ দেখাবে হিন্দু সমাজই ▯ ৯

সি বি আইয়ের বিরুদ্ধে আন্দোলনে গোয়েন্দাদের কর্তব্যনিষ্ঠা বাড়বে ▯ গূঢ়পুরুষ ▯ ১০

ধর্মান্তরকরণ বন্ধে আইন চায় বিশ্ব হিন্দু পরিষদ ▯ ১১

শক্তিশালী ভারত গড়তে শরণার্থী ও অনুপ্রবেশ সমস্যার আশু সমাধান প্রয়োজন ▯ অসিত বরণ ঠাকুর ▯ ১২

একনজরে বিশ্ব হিন্দু পরিষদ ▯ ১৫

হিন্দু সম্মেলনে সংকল্প, পশ্চিমবঙ্গকে আর ভাগ হতে দেব না ▯ ডা: শচীন্দ্রনাথ সিংহ ▯ ১৯

ভারতে ধর্মান্তরকরণ ও বিশ্ব হিন্দু পরিষদের ভূমিকা ▯ শ্রীমদ্ দেবানন্দ ব্রহ্মচারী ▯ ২১

হিন্দু জাগরণের অগ্রদূত কর্মবীর দাদাসাহেব আপ্তে ▯ ২৪

হিন্দু জাগরণের অগ্রদূত নিরলস যোদ্ধা অশোক সিংঘল ▯ ২৫

ব্যক্তি যখন আদর্শের মূর্ত স্বরূপ— আচার্য গিরিরাজ কিশোর ▯ ২৬

শ্রীরামজন্মভূমি মুক্তি আন্দোলন, পশ্চিমবঙ্গে শ্রীরামশিলা পূজন ▯ বাসুদেব পাল ▯ ২৭

সমাজ সেবায়ও বিশ্ব হিন্দু পরিষদ অবিচল ▯ সুকেশ মণ্ডল ▯ ৩৩

আলাপচারিতায় বিশ্ব হিন্দু পরিষদের প্রাক্তন রাজ্য সম্পাদক ড. সীতানাথ গোস্বামী ▯ সারথি মিত্র ▯ ৩৫

ভারতবর্ষের ব্রহ্মকমল 'গীতা'— একটি পর্যালোচনা ▯ অচিন্ত্য বিশ্বাস ▯ ৩৭

নিত্যজীবনে প্রেরণার পাথেয় গীতা ▯ নবকুমার ভট্টাচার্য ▯ ৪১

হিন্দুত্ব বিশ্বকে ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ করে ▯ ড. স্বরূপ প্রসাদ ঘোষ ▯ ৪৩

বিশ্ব হিন্দু পরিষদের মার্গদর্শক মণ্ডলী ▯ রোহিণী প্রসাদ প্রামাণিক ▯ ৪৫

প্রকাশিত হবে ২৯ ডিসেম্বর ২০১৪

স্বস্তিকা

প্রকাশিত হবে ২৯ ডিসেম্বর ২০১৪

আগামী সংখ্যার আকর্ষণ

সন্ত্রাসবাদ

সন্ত্রাসবাদী হামলার ক্ষেত্রে পাক-বাংলাদেশ যৌথ উদ্যোগ এখন প্রমাণিত। সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অনুপ্রবেশ। সীমান্ত অঞ্চলে অনুপ্রবেশকারীরা এখন সন্ত্রাসবাদীদের এজেন্ট। এই নিয়েই এবারের বিষয়— একই মুদ্রার এপিঠ-ওপিঠ সন্ত্রাসবাদ ও অনুপ্রবেশ। লিখেছেন— **ড. প্রণব কুমার চট্টোপাধ্যায় ও অম্লানকুসুম ঘোষ।**

HB ®

INDIA'S NO. 1 IN ISI MARKED HEAVY PIPE FITTINGS

HB ® AN ISO 9002 CERTIFIED CO.

Authorised Distributor

NATIONAL PIPE & SANITARY STORES

54, N. S. Road
Kolkata-700001
Ph : 2210-5831/5833

3, Jadu Nath Dey Road,
Kolkata-12, Ph. 2215-6804,
Fax : 2212-2803

Sister Concern

Partha Sarathi Ceramics

4, College Street,
Kolkata-700012
Ph: 2241 6413 / 5986
Fax : 033-22256803
e-mail : nps@vsnl.net
website ;
www\nationalpipes.com

সানরাইজ®
সর্ষে পাউডার



SUNRISE® PURE

স্বাস্থ্য-সম্মত, ঝাঁঝালো - খেতে বড্ড ভালো।

সম্পাদকীয়

প্রয়োজন হিন্দুসমাজের সচেতনতা

সারদাকাণ্ডে ধৃতদের সমর্থনে কলকাতায় মিছিল হইয়াছিল, জঙ্গিসন্ত্রাসবাদীদের সমর্থনে ময়দানে মিটিং হইয়াছিল, এইবার আই এস আই এস জঙ্গি সন্দেহে বেঙ্গালুরু হইতে ধরা পড়িয়াছে উত্তর ২৪ পরগনার কৈখালির এক বাসিন্দা। মেহেদি মাসরুদ বিশ্বাস নামে পেশায় ইঞ্জিনিয়ার এই জঙ্গি টুইটারে জিহাদি আদর্শ প্রচার করিত। ইরাকে বেশ কিছু সাংবাদিকের মুণ্ডচ্ছেদ করিয়াছে আই এস আই এস জঙ্গিরা। তাহাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রহিয়াছে এই জঙ্গির। সম্প্রতি চ্যানেল ফোর নামক একটি বৃটিশ চ্যানেল জানাইয়াছিল, আই এস আই এস জঙ্গিদের সবচাইতে জনপ্রিয় টুইটার অ্যাকাউন্টের মালিক বেঙ্গালুরুতে থাকে। ইহার পরেই পুলিশি অনুসন্ধানে ধরা পড়িয়াছে এই রত্নটি। একদা শিক্ষাসংস্কৃতি বিজ্ঞান দর্শন-সহ নানা বিষয়ে গুণী মানুষ রাজ্যের সীমা ছাড়াইয়া সমগ্র বিশ্বে জনপ্রিয় হইয়াছিলেন, এখনও আছেন। রবীন্দ্রনাথ হইতে আরম্ভ করিয়া এই রাজ্যের বহু জ্ঞানী-গুণীজন সমগ্র বিশ্বে আজও সমাদৃত। কিন্তু আজকের পশ্চিমবঙ্গে যে সংস্কৃতি প্রবাহিত হইতেছে তাহাতে রাজ্যের সুনাম নষ্ট হইবার পথে। এই মুহূর্তে রাজ্য সরকার ও তাহার মন্ত্রীদের গায়ে অসততার দাগ এবং দলের গায়ে জঙ্গিদের স্পর্শ রাজ্যকে কলঙ্কিত করিয়াছে। ইহার পরে পশ্চিমবঙ্গ সমগ্র দেশকে কিভাবে পথ দেখাইবে? এককালে মধুর বচনের জন্য রাজ্যের মানুষের সুনাম ছিল, এখন তাহাও নষ্ট হইয়াছে। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর মুখেই কুকথার বিরাম নাই, অন্যের কথা কী আর বলা যাইবে। নষ্টামির রাজ্য হিসেবে পশ্চিমবঙ্গ এখন বিশ্বে পরিচিত হইতেছে। সাংস্কৃতিক জগতের কতিপয় মানুষ মঞ্চ আলো করিয়া এই নষ্টামিকে স্বীকৃতিও দান করিতেছে।

কেন এই অধঃপতন? কেশবচন্দ্র সেন, রামমোহন, বিবেকানন্দ, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের পর সাম্প্রতিককালে কেহ সামাজিক আন্দোলনে সামিল হন নাই। রাজনৈতিক নেতারা এই স্থান অধিকার করিয়াছেন। ইহার ফলে দেশপ্রেমের বদলে দলপ্রেম, সততা মূল্যবোধ মানবতার বদলে স্থান করিয়া লইয়াছে অসততা, চৌর্যবৃত্তি ও মিথ্যার বেসাতি। রাজনৈতিক নেতা-নেতৃদের নিকট দেশের থেকে দল প্রিয়। সেই জন্যই দেশবিরোধী জঙ্গিদের সমর্থনে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীসহ মন্ত্রীদের এত সমর্থন। কারণ পশ্চিমবঙ্গ এই মুহূর্তে জঙ্গিসন্ত্রাসবাদীদের ঘাঁটি। মুক্ত চিন্তার স্থান পশ্চিমবঙ্গ ক্রমশই ইসলামিক মৌলবাদীদের কব্জায় চলিয়া যাইতেছে। বস্তুত আজ পশ্চিমবঙ্গসহ সারা দেশেই ভোটের স্বার্থে তোষণের রাজনীতি এমন পর্যায়ে পৌঁছাইয়াছে যেখানে জাতীয় স্বার্থ অবধি তুচ্ছ হইয়া পড়িয়াছে। যে সেকুলারপন্থীরা দিবারাত্র হিন্দুত্বের আদ্যশ্রাদ্ধ না করিয়া জলস্পর্শ করেন না, তাহারা কিন্তু ইসলামিক মৌলবাদীদের অত্যাচারে নিশ্চুপ থাকেন। সমগ্র মুর্শিদাবাদ আজ মৌলবাদী জঙ্গিদের কবলে চলিয়া গিয়াছে। এই বছর মুর্শিদাবাদ জেলার কোনো বিদ্যালয়ে আর সরস্বতী পূজা করা চলিবে না বলিয়া জঙ্গিরা ইতিমধ্যেই হুমকি দিয়াছে। পূর্বেও দুর্গাপূজা লইয়া একইরকম হুমকি দেওয়া হইয়াছিল। প্রশাসন যথারীতি নীরব ও নিশ্চুপ। দেশবিরোধী নানা কার্যকলাপ বন্ধ করিতে প্রশাসন সচেষ্ট নয়। রাজনৈতিক দলগুলি ভোটের লোভে দেশবিরোধী কার্যকলাপে মদত দিয়া চলিতেছে।

নীরোগ শরীর ও মানসিক প্রসন্নতা লাভের জন্য যে যোগ-কে রাষ্ট্রসঙ্ঘের ১৭৫টি দেশ আজ স্বীকৃতি দিয়া ২১ জুনকে আন্তর্জাতিক যোগদিবস হিসাবে ঘোষণা করিয়াছে, সেই যোগীঋষির দেশ ভারতবর্ষে আজ যোগকে হিন্দুদের বিশেষ উপাসনা-পদ্ধতি অর্থাৎ সাম্প্রদায়িকতার তকমা দিয়া ব্রাত্য রাখিবার চেষ্টা চলিতেছে।

আজ প্রতিদিন সারা দেশে দুর্নীতি, বিভিন্ন কেলেঙ্কারি, ধর্ষণ, চুরি-ডাকাতি ইত্যাদি অপরাধমূলক কাজকর্ম সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত হইতেছে। মূল্যবোধের শিক্ষার অভাবই তাহার প্রধান কারণ বলিয়া সকলে মনে করেন। অথচ সর্বকালে সমস্ত মানুষের জন্য কল্যাণকর সেই নীতিশিক্ষার গ্রন্থ 'গীতা'-কে জাতীয় গ্রন্থের মর্যাদা দেওয়ার চেষ্টা হইলে সেকুলারবাদী ও মৌলবাদীরা রে-রে করিয়া উঠিতেছে। নিজেদের সঙ্কীর্ণ স্বার্থে রাজনৈতিক দলগুলি সমাজের অবক্ষয় রোধ করিতে সচেষ্ট হইবে না। দেশ তথা জাতিকে বাঁচাইতে তাই বিশ্ব হিন্দু পরিষদের মতো হিন্দু সংগঠনগুলিকে সচেষ্ট হইতে হইবে। মতলববাজ সেকুলারবাদী ও বিস্তারবাদী মৌলবাদীদের বিরুদ্ধে হিন্দুসমাজকেই আজ রুখিয়া দাঁড়াইতে হইবে।

সুভাষিত

উদয়ে সবিতা রক্তো রক্তশ্চাস্তমনে তথা।

সম্পত্তৌ চ বিপত্তৌ চ মহতামেকরূপতা।।

উদয় এবং অস্ত দুই সময়েই সূর্য রক্তিম থাকে। যাঁরা মহৎ তাঁদের আচরণ ঐশ্বর্যে ও বিপদে একইরূপ থাকে।

With Best Compliments-

TRADEWELL ENTERPRISES

'তপোভূমি নৈমিষারণ্য'
যাত্রীনিবাস ও দর্শনের ব্যবস্থা আছে

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ

ডাক-নৈমিষারণ্য, জেলা-সীতাপুর
উত্তরপ্রদেশ, পিন-২৬১৪০২
(হরিদ্বারগামী ট্রেনে লখনউ অথবা হরদই স্টেশন থেকে যাওয়া যায়)

তীর্থযাত্রী নিবাস ও মন্দির নির্মাণকল্পে আপনার দান প্রিয়জনের স্মৃতিরক্ষার্থে সাদরে গৃহীত হবে।

স্বামী ত্রিগুণানন্দ
ফোন-০৯৯৩২৯০৬৮৮১
০৯৪৪১৪৩১৯২০

১৯৪৮ সাল থেকে নিরবচ্ছিন্নভাবে প্রকাশিত
জাতীয়তাবাদী বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক

প্রতি সংখ্যা ১০ টাকা

স্বস্তিকা

বার্ষিক গ্রাহকমূল্য ৪০০টাকা

অবহিত হবার এবং অবগত করার নির্ভরযোগ্য মাধ্যম

—ঃ যোগাযোগ করুন ঃ—
২৭/১বি, বিধান সরণি, কোলকাতা-৭০০০০৬
দূরভাষ (০৩৩) ২২৪১০৬০৩, ২২৪১৫৯১৫

আমি মদন বলছি...

প্রিয় পাঠক,

এটা আমাদের অত্যন্ত দুর্ভাগ্যের বিষয় যে মাননীয় ক্রীড়া ও পরিবহণ মন্ত্রী মদন মিত্র এখন জেলে। অভিযোগের কথা আপনারা সবই জানেন। তাঁকে যখন সিজিও কমপ্লেক্স থেকে আলিপুর আদালতে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল তখন আমিও চলে গিয়েছিলাম মন্ত্রীমশায়কে দেখতে। তখনই একটা কাগজ উড়ে আসে আমার সামনে। কুড়িয়ে দেখি একটি চিঠি। জানি না আমার জন্যই মন্ত্রীমশায় তা উড়িয়ে দিয়েছেন কিনা। তবে আদ্যপ্রান্ত পড়ে মনে হলো প্রথমদিন সিবিআই হেফাজতে থাকার সময়ই তিনি সেটা লিখেছিলেন। আপনাদের জন্য সে চিঠিটি পাঠিয়ে দিলাম। মনে হয় তাঁর কোনও দিদির উদ্দেশে লেখা।

সুন্দর মৌলিক



দিদি,

বড় কষ্ট পেলাম। সিবিআই জেরায় জেরায় যা জিজ্ঞেস করেছে সেসব জানাই ছিল। প্রস্তুতিও ছিল। তাই তা তেমন কষ্ট দেয়নি। কষ্ট দিয়েছো তুমি। জানি না কতদিন তোমার সঙ্গে দেখা হবে না। কিন্তু সিবিআইয়ের হাতে যাওয়ার আগে তোমার সঙ্গে একদিন দেখা করে আসতে চেয়েছিলাম। নিদেনপক্ষে একটু কথা বলতে চেয়েছিলাম। কিন্তু তা আর হলো না। তুমি একটিবারের জন্য আমার ফোনটা তুললে না। বেজেই গেল। বেজেই গেল। কয়েকবার কেটেও দিলে। কতজনকে দিয়ে, কতবার চেষ্টা করলাম কিন্তু সব বিফলে গেল। কদিন আগেও যাঁরা তোমার কাছাকাছি যাওয়ার জন্য আমায় ধরাধরি করেছে তাঁদেরও ধরলাম। কিন্তু সবার এক কথা, তুমি নাকি আমাকে এড়িয়ে চলছ। একে একে মনে পড়ল কত সকাল, কত দুপুর, কত বিকেল, কত রাত-দুপুর তোমার সঙ্গে কাটিয়েছি। আমার সমবয়সীদের তুমি দাদা বলে সম্বোধন কর, কিন্তু আমায় নাম ধরে, তবু কিছু মনে করিনি। একসঙ্গে রাজনীতি শুরু করে আজ তুমি আমাকে ছেড়ে অনেক ওপরে গিয়ে আমার বস হয়েছ। নতুনেরা তোমার কাছে কত সম্মান পায় তা দেখেও মুখে রা কাড়িনি। একটিবার তুমি মদন (অনেক সময় মদনা) বলে ডাকলেই চলে গেছি। যা বলেছ সব করেছি।

প্রিয়দার হাত ধরে রাজনীতিতে এসেছি। জীবনবিমার চাকরি করতে গিয়ে ইউনিয়নটা মন দিয়ে করেছিলাম। তাই তারপর ট্যাক্সি ইউনিয়ন, মেট্রোরেলের ইউনিয়নের মাথা হয়েছিলাম তোমার কথায়। ভবানীপুরের নেতা হয়েই ছিলাম। শেষে সারদার ইউনিয়নেরও মাথায় বসেছি। তুমি ছাড়া আর একজনের কথা আমি শুনতাম। প্রিয়দার সঙ্গে কংগ্রেস ছেড়ে কংগ্রেস(স)-এ গেছি এবং ফিরেও এসেছি। এরপর তোমার হাতে পড়েছি। এবার সিবিআইয়ের হাতে পড়লাম।

দিদি, তোমার পাশের আজকের নেতারা কখনও তোমার সঙ্গে এসেছে, গেছে। কিন্তু আমি একটিবারের জন্যও নয়। সব সময় পাশে থেকেছি। সুখেও দুঃখেও। একান্ত অনুগত মদন হয়ে থেকেছি। তোমার মিটিংয়ে লোক জড়ো করেছি, ১৯৯৩-এর একুশে জুলাই তোমার নির্দেশে মহাকরণ অভিযানে প্রতিরোধ ভেঙে দেওয়ার ডাক দিয়েছি। সেই ঘটনায় মৃত ১৩ জন আজও তোমার রাজনীতির বড় ভরসা। শহিদ তর্পণে পাগলু ড্যান্স হোত না যদি এই মদন না থাকত।

দিদি, এসব কি ভুলে গেলে! সেই যে যেবার ২০০৪ সালে জঙ্গিপুরে প্রণব মুখোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে প্রার্থী হতে হবে বলে তুমি বলেছিলে। আমি একবারও না বলিনি। শেষে অবশ্য সিস মহম্মদ প্রার্থী হন। এরপর ২০০৯ সালে বিষ্ণুপুর পশ্চিমে উপনির্বাচন। তুমি বলেছিলে, জিততেই হবে মদন। করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে। আমিও ঝাঁপিয়ে পড়লাম। সেই জয়ই তো প্রথম বুঝিয়ে দিল ২০১১ সালে পরিবর্তন আসছে।

আমারও পরিবর্তন এল। সেখানে গিয়েই সারদার পাঁকে ডুবলাম। সুদীপ্তর টাকার কাছে হেরে গেলাম। সেই থেকে এই পর্যন্ত দিদি ছাড়া কিছু জ্ঞান করিনি। তবু দিদি, সারদার জন্য তোমার আগে,

আরও অনেকের আগে আমায় হাজতে যেতে হলো। আমি যাদের ফলো করেছি তারা আজ পিছনে। কুণাল, টুম্পাইদের পাশে এখন আমি। দিদি, তুমি কি আগে থেকেই জানতে কার পর কে অ্যারেস্ট হবে! তুমিই তো বলে দিয়েছিলে, কুণাল চোর?, টুম্পাই চোর?, মদন চোর?...। এবার তো তবে মুকুল দা আর তারপরই তুমি!

আমি একটু রসে বসে থাকতে ভালোবাসতাম। দিনের বেলা ঘাম ঝরালেও রাতটা মৌজ করতে ভালোবাসতাম। বারোটা পুজো কমিটির হোতা, ১৩টা ক্লাবের কর্তা, ১৪টা রঙের বড় ঝুল পাঞ্জাবি, ১৫টা ডিজাইনের সাদা স্নিকার, এসব আমার শখ। আইনজীবী পিয়ালি মুখোপাধ্যায় আমার ঘনিষ্ঠ ছিল মানছি। কিন্তু কপাল খারাপ রাজারহাটে ওর বডি উদ্ধার হয়ে সব জানাজানি হয়ে গেল। গোপন কথাটি রইলো না গোপনে। বাজারে নানারকম মুখোরোচক খবর আমদানি হলো। তুমি অমনি ক'দিন মুখ ফিরিয়ে রাখলে। তোমার আমার সম্পর্কের জোয়ার-ভাটা অবশ্য এইরকম অনেক হয়েছে। তাই আবার সব ঠিকও হয়ে গেছে একদিন।

সারদার টাকা তো আমি একা খাইনি দিদি। আমার ছবি তো বিক্রি করিনি। বরং তোমার ছবির প্রশংসা করে দাম বাড়িয়েছি। যখন যে ক্লাবকে কাছে আনতে চেয়েছ তখনই ক্রীড়ামন্ত্রীর প্রভাব খাটিয়ে করে দেখিয়েছি। কলকাতায় মেসি থেকে কেকেআর উৎসব কোনটা দলের জন্য করিনি বলো তো? দলের মিছিল, জনসভায় লোক সাপ্লাই, সেলিব্রিটি সাপ্লাই সবেতেই তুমি সবার আগে 'মদন' বলে ডেকেছ। মদন হাজিরও হয়েছে। কিন্তু শেষ কটা দিন কেন এমন করলে? হাসপাতাল থেকে হাসপাতালে পালিয়েছি, লুকিয়ে থেকেছি কিন্তু একটিবারের জন্যও তুমি খোঁজ নাওনি। মনে হচ্ছে আমি যেন দিদির ভাই নই, সুদীপ্তর লোক, সারদার লোক। কিন্তু সুদীপ্ত কিংবা সারদা তো আমাকে তোমার লোক বলেই চিনত!

তুমি একবারও ফোন ধরলে না। দেখা করা দূরে থাক কথাও বললে না। কিন্তু যেই না আমাকে গ্রেপ্তার করেছে অমনি শুরু হয়ে গেল তোমার রাজনীতির খেলা। নবান্নে কেন্দ্রকে তোপ দাগলে, ময়দানে জমায়েত করলে, এখানে ওখানে মিছিল, অবরোধ করলে। সবাই ভাবছে আমার জন্যই এসব হচ্ছে। কিন্তু তোমাকে অনেককাল, অনেক কাছ থেকে দেখা আমি জানি এসব কিছুই আমার জন্য নয়। তুমি আসলে কেন্দ্রকে বোঝাতে চাইছ, মুকুলকে ছুঁলে কত বড় আন্দোলন হবে, তোমাকে ছুঁলে কত বড় অনথ হবে। তবে আমি বুঝে গেছি সিবিআই খুব একটা ভয় পাচ্ছে না।

যাক দিদি, তোমরা ভালো থেকো। জানি না আবার কবে মুখোমুখি দেখা হবে। ভিতরে না বাইরে তাও জানি না।

ইতি। তোমার মদন।

"শুধুমাত্র গীর্জাগুলি নয়, কিন্তু য়ুরোপের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহও একদিন ভারতবর্ষের চিন্তাবিদদের নামে শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করবে। একদিন এইসব চিন্তানায়করা অরণ্যের বৃক্ষচ্ছায়ে চীরধারণ করে অথবা সামান্য পরিচ্ছেদে আবৃত হয়েও সত্যসমূহকে উপলব্ধি করেছিলেন, সে নিগূঢ় ও সর্বাত্মক মহান সত্যকে, জাগতিক সুখস্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি মূঢ়ভাবে আসক্ত য়ুরোপ কোনদিন স্বপ্নেও ভাবেনি।"



— ভগিনী নিবেদিতা

সৌজন্যে : ভগিনী নিবেদিতা সেবা ভারতী

ওয়ার্ল্ড হিন্দু কংগ্রেসের বার্তা

আগামী দিনে বিশ্বকে পথ দেখাবে হিন্দু সমাজই

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ গত ২১ থেকে ২৩ নভেম্বর নতুন দিল্লীতে আয়োজিত হয়ে গেল তিন দিনের ঐতিহাসিক বিশ্ব হিন্দু সম্মেলন (ওয়ার্ল্ড হিন্দু কংগ্রেস)। বিশ্বের ৫৪টি দেশের ১৭০০ জনেরও বেশি প্রতিষ্ঠিত মানুষ এই সম্মেলনে যোগদান করেন। উপলক্ষ্য বিশ্ব হিন্দু পরিষদের সুবর্ণ জয়ন্তীবর্ষ। অনুষ্ঠানের আয়োজনও ছিল সুবিশাল। সাতটি সমান্তরাল সম্মেলনে ৪৫টি সেশনে ২০০ জন বক্তা তাঁদের বক্তব্য পেশ করেন। এঁদের বক্তব্যে একটা বিষয়ই উঠে এল যে আগামী দিনে বিশ্বকে পথ দেখাবে হিন্দু সমাজই। সম্মেলনে যোগদানকারীদের মধ্যে যেমন ছিলেন শিক্ষাবিদ, বৈজ্ঞানিক, গবেষক, বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য, সহ-উপাচার্য, পরিচালনকারী অছি পর্ষদের সদস্যরা, তেমনই উপস্থিত হয়েছিলেন বিভিন্ন ক্ষেত্রের বিখ্যাত শিল্পপতি, ব্যবসায়ী, ব্যাঙ্ক-মালিক, অর্থনীতিবিদ, ব্যবসায়ী সংগঠনের নেতৃত্বস্থানীয় ব্যক্তি; এছাড়াও সাংসদ, বিধায়ক, যুবনেতা, সাংবাদিক, সংবাদপত্রের সম্পাদক, সর্বোপরি গোটা বিশ্বের বিভিন্ন হিন্দু সংগঠনের নেতা— সবধারার মানুষই যোগদান করেছিলেন এই ঐতিহাসিক সম্মেলনে। সমাজে তাঁদের অনবদ্য অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ দলাই লামা এবং কোয়েম্বাটোরের অর্শবিদ্যা গুরুকুলমের স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতীকে সম্বর্ধিত করা হয়। আগামী বছর লন্ডনে বিশ্ব হিন্দু অর্থনৈতিক ফোরাম মিলিত হবে বলে জানানো হয়েছে সংগঠনের পক্ষ থেকে। পরবর্তী বিশ্ব হিন্দু সম্মেলনে আয়োজিত হবে ২০১৮-য় আমেরিকায়। কংগ্রেসে সরসঙ্ঘচালক মোহন ভাগবত, সরকার্যবাহ ভাইয়াজী যোশী, অশোক সিংহল, প্রবীণ তোগাড়িয়া প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে এই কংগ্রেসের মূলসুর 'সংগচ্ছধ্বং সংবদধ্বং' বেঁধে দেন দলাই লামা। তিনি বলেন, 'বৌদ্ধ ও হিন্দুরা আধ্যাত্মিক ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ। বিশ্বে সম্প্রীতির জন্য অহিংসা ও ধর্মীয় সম্প্রীতির ব্যাপারে হিন্দু মূল্যবোধ আজ সবচেয়ে বেশি দরকার। আজকে আত্মকেন্দ্রিক মনোভাবের জন্যই যুদ্ধ, হিংসা, সন্ত্রাসবাদ ইত্যাদি সমস্যায় জর্জরিত হচ্ছে পৃথিবী। এই পরিস্থিতিতে ভারত তার অহিংসা, আধ্যাত্মিকতা, জ্ঞান ও ধর্মীয় সম্প্রীতির ঐতিহ্য ও বাণী নিয়ে বিশ্বকে পথ দেখাতে পারে। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সরসঙ্ঘচালক মোহন ভাগবত বলেন, 'বিশ্বের আজ সবচেয়ে বেশি দরকার হিন্দুচিন্তন এবং আগামীদিনেও এই প্রয়োজন ফুরোবে না। হিন্দুদের দায়িত্ব বিশ্বকে শিক্ষাদানের ও পথপ্রদর্শনের। 'হিন্দু' শব্দের ব্যাখ্যা করে তিনি বলেন, 'হিন্দু সেরকমই একজন, যিনি সমস্ত মানব-বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের সন্ধান পান।'



ওয়ার্ল্ড হিন্দু কংগ্রেসে উপস্থিত দেশ-বিদেশের প্রতিনিধিরা।

বিশ্ব হিন্দু পরিষদের কিংবদন্তী নেতৃত্ব অশোক সিংহল জানান, বিগত পঞ্চাশ বছরে এই প্রতিষ্ঠান দৃঢ় ও সমর্থ হিন্দু-সমাজ গড়তে সক্ষম হয়েছে। গোটা বিশ্বের উন্নতিতে হিন্দুত্বের প্রয়োজনীয়তার কথাও তুলে ধরেন তিনি। আর এস এসের সরকার্যবাহ ভাইয়াজী যোশী তাঁর বক্তব্যে বলেন, হিন্দুদের সামনে তাদের অস্তিত্ব, সমাজ ও সংস্কৃতি রক্ষার চ্যালেঞ্জ উপস্থিত হয়েছে তার কথাও ভুলে গেলে চলবে না। সারা বিশ্ব থেকেই হিন্দুরা যেভাবে এই কংগ্রেসে যোগদান করেছেন তাতে গোটা পৃথিবীর কাছে একটি সদর্থক বার্তা যাবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন। বিশ্ব হিন্দু পরিষদের সভাপতি ডাঃ প্রবীণ তোগাড়িয়া তাঁর ভাষণে হিন্দু সমাজের সর্বাঙ্গীণ উন্নতিকল্পে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের পাঁচদফা পদক্ষেপের কথা স্মরণ করিয়ে দেন। এই পাঁচ দফা হলো— হিন্দুদের সংযোগকারী ঐক্য, হিন্দুদের সামগ্রিক নিরাপত্তা, হিন্দু-সমৃদ্ধি, হিন্দু-মর্যাদা ও হিন্দু-স্বাতন্ত্র্যতা। তিনি তথ্য-পরিসংখ্যান তুলে ধরে জানান, দেশের ৫০ হাজার গ্রামে ২০ লক্ষেরও বেশি শিশু শিক্ষার বন্দোবস্ত করেছে ভি এইচ পি। পরিষদের ভিশন ২০২৫ অনুযায়ী ১ লক্ষ গ্রামে ৫০ লক্ষেরও বেশি শিশুর শিক্ষার ব্যবস্থা করবে তারা। বিশ্ব হিন্দু কংগ্রেসে সঙ্ঘের সহ সরকার্যবাহরা যেমন দত্তাত্রেয় হোসবালে, সুরেশ সোনী, ড. কৃষ্ণগোপাল ছাড়াও আর এস এস-এর বিশ্ব বিভাগ আহ্বায়ক সৌমিত্র গোখলে, বিশ্ব হিন্দু পরিষদের সাধারণ সম্পাদক চম্পত রাই ও আন্তর্জাতিক সভাপতি রাঘব রেড্ডি প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।■

সি বি আইয়ের বিরুদ্ধে আন্দোলনে গোয়েন্দাদের কর্তব্যনিষ্ঠা বাড়বে

সারদা প্রতারণা মামলায় অভিযুক্ত মন্ত্রী মদন মিত্রকে বাঁচাতে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যেভাবে দলের লুম্পেন কর্মী সমর্থকদের ময়দানে নামিয়েছেন তার নজির ভারতীয় রাজনীতিতে নেই। এর আগে বিহারের মুখ্যমন্ত্রী লালুপ্রসাদ যাদব এবং তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী আর্থিক দুর্নীতির দায়ে জেলযাত্রা করেছেন। কিন্তু তাঁরা কেউই সমর্থকদের রাজ্যজুড়ে আগুন জ্বালাবার নির্দেশ দেননি। তৃণমূল নেত্রী প্রকাশ্যে ঘোষণা করেছেন, 'আমি জয়ললিতা নই যে চুপ করে থাকবো। আমি প্রত্যাঘাত করবো। মদন দলের সম্পদ। মদন জেলে গেলে বাংলার ক্রীড়া ও সংস্কৃতি ভেঙে যাবে।' তাই নেত্রীর নির্দেশে তৃণমূল কর্মীরা জনজীবন বিপর্যস্ত করতে পথে নেমে পড়েছেন। বিপদটা ঠিক এখানেই। রাজ্যজুড়ে যতই পথ অবরোধ, ভাঙচুর, মারদাঙ্গা চলবে ততই সাধারণ মানুষ তৃণমূল-বিরোধী হবে। এমনিতেই সারা রাজ্যজুড়ে তৃণমূলের জনসমর্থনে এখন ভাটার টান চলছে। নেত্রীর জনবিরোধী উস্কানিতে তা আরও তীব্র হবে। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে সারদা কেলেঙ্কারির তদন্ত করছে সিবিআই। যদিও নেত্রী প্রচার করছেন যে কেন্দ্রের মোদী সরকারের নির্দেশেই তৃণমূলের বিরুদ্ধে সিবিআই চক্রান্ত করছে। নেত্রী জানেন যে দ্বিতীয় ইউপিএ সরকারের আমলে সুপ্রিম কোর্ট সিবিআই তদন্তের আদেশ দেয়। তবু নেত্রী 'ন্যাকাচণ্ডি' সেজে মদনের গ্রেপ্তারকে বিজেপির রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র বলে বাজার গরম করছেন। নেত্রী একথাও জানেন যে রাজ্য কংগ্রেস নেতা আবদুল মান্নানের দায়ের করা মামলার পরিপ্রেক্ষিতেই সুপ্রিম কোর্ট সিবিআই তদন্তের আদেশ দেয়। তবু তিনি বিজেপিকেই

গূঢ়পুরুষের কলম

দুষছেন। কারণ হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গে বিজেপির অভূতপূর্ব জনসমর্থন বৃদ্ধি। নেত্রীর প্যানিক অ্যাটাক হয়েছে। মদনের মতোই তাঁর মনে হচ্ছে বিজেপির নেতারা তাঁর গলা টিপে ধরতে আসছে।

দিদি একটা বড় ভুল করছেন। মদনকে বাঁচাতে তিনি যেভাবে দলের লুম্পেন কর্মীদের সিবিআই গোয়েন্দাদের কাজকর্মে বাধা দেওয়ার উস্কানি দিচ্ছেন তাতে 'ফেয়ার ট্রায়াল' চেয়ে সিবিআই অভিযুক্তদের মামলা অন্য রাজ্যে নিয়ে যেতে সুপ্রিম কোর্টে আবেদন জানাতে পারে। যতদূর জানি যে মূল মামলাকারী কংগ্রেসের আবদুল মান্নান ইতিমধ্যেই সারদা মামলা অন্য রাজ্যে স্থানান্তরিত করতে সুপ্রিম কোর্টে আবেদন করেছেন। জয়ললিতার বিরুদ্ধে দুর্নীতির মামলা তামিলনাড়ু থেকে সরিয়ে কর্ণাটকে নিয়ে যাওয়া হয় দলীয় কর্মীদের অশান্তি ঠেকাতে। মদন মিত্রকে আলিপুর আদালতে নিয়ে গেলে তৃণমূল কর্মীরা যেভাবে বাধা দেয় তেমন ঘটনা দ্বিতীয়বার ঘটলে সারদা মামলায় অভিযুক্তদের অন্য রাজ্যে বিচারের জন্য পাঠাতে বাধ্য হবে দেশের সর্বোচ্চ আদালত। সেক্ষেত্রে দিদির ভায়েরা কী করবে? তৃণমূল একটা ছোট আঞ্চলিক দল। পশ্চিমবঙ্গের বাইরে দলের কোনো অস্তিত্ব নেই। এসব কথা দিদিকে বোঝাবে কে? আমাদের দিদি সবজান্তা। সিবিআইকে হঠাতে দিদি পাবলিকের ১১ কোটি টাকা খরচ করে মামলাবাজি করেছেন। এই খরচের কত কোটি টাকা দলের কোন কোন আইনজীবীর পকেটে ঢুকেছে তার তদন্ত করবে কে?

দিদি সিবিআইয়ের বিরুদ্ধে যতই আক্রমণ শানাবেন ততই গোয়েন্দারা চোয়াল শক্ত করে তদন্তের কাজ করবেন। কারণ দিদি বিষয়টিকে সম্মান রক্ষার প্রশ্নে নিয়ে গেছেন। ফলে তদন্তে সামান্যতম ঢিলেমি সিবিআই গোয়েন্দারা এখন দেখাবেন না। তদন্তের গতি প্রকৃতি থেকে বোঝা যাচ্ছে যে চলতি ডিসেম্বর মাসেই তৃণমূলের রাজ্যসভার সাংসদ আহমেদ হাসান ইমরানকে সিবিআই গ্রেপ্তার করবে। ইমরানের জঙ্গি সংযোগ এবং সারদার টাকা বাংলাদেশী জামাতের কাছে পাচার করার অকাট্য প্রমাণ সিবিআই সংগ্রহ করেছে। ইমরানের গ্রেপ্তার এখন শুধুই সময়ের অপেক্ষা। শুধু ভয় হয় ইমরানের গ্রেফতারের প্রতিবাদে দাঙ্গার প্ররোচনা দিলে রাজ্যজুড়ে অশান্তির আগুন না জ্বলে উঠে। দিদির কাছে হাতজোড় করে অনুরোধ, এই পাপটা যেন তিনি না করেন। সারদা মামলায় অভিযুক্তদের বিচার আদালতে হবে। সেখানে তাঁরা নির্দোষ প্রমাণিত হলে সসম্মানে মুক্তি পাবেন। বিচার ব্যবস্থাকে সংবিধান মেনে চলতে দিন। লুম্পেনদের পথে নামিয়ে দেশের গণতান্ত্রিক কাঠামোকে বিপন্ন করবেন না। দিদি, দয়া করে এবার চক্রান্ত চক্রান্ত বলে গলাবাজিটা থামান। মানুষ কেন, ঘোড়াও শুনে হাসছে। ■



ধর্মান্তরকরণ বন্ধে আইন চায় বিশ্ব হিন্দু পরিষদ



মুম্বাইয়ে বিরাট হিন্দু সম্মেলনে অশোক সিংহল ও শঙ্করাচার্য জয়েন্দ্র সরস্বতী।

নিজস্ব প্রতিনিধি।। 'এক সময় সারা বিশ্বে হিন্দুরাই ছিল। এখন হিন্দুর সংখ্যা কমতে কমতে ১০০ কোটিতে ঠেকেছে। বর্তমানে আমাদের দেশে ৮২ শতাংশ হিন্দুর বাস। আমরা যদি সজাগ ও সতর্ক না হই তবে আর কয়েক দশকের মধ্যে হিন্দুরা ৪৬ শতাংশে নেমে আসবে। ধর্মান্তরকরণ যদি দোষের হয় ধর্মান্তরকরণ রোধে সরকার বিল আনছে না কেন?' গত ১৪ ডিসেম্বর মুম্বাইতে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের সুবর্ণজয়ন্তী উদযাপন উপলক্ষে আয়োজিত বিরাট হিন্দু সম্মেলনে কথাগুলি বলেন পরিষদের আন্তর্জাতিক সভাপতি প্রবীণভাই তোগাড়িয়া। মুম্বই-য়ের MMRDA (মুম্বই মেট্রোপলিটন রিজন ডেভেলপমেন্ট অথরিটি) ময়দানের বান্দ্রা-কুরলা কমপ্লেক্সে এই সম্মেলন হয়। উল্লেখ্য, কয়েকদিন আগে উত্তরপ্রদেশের আগ্রায় ২০০ মুসলমান যারা কয়েকপুরুষ আগে মুসলমান ধর্মে ধর্মান্তরিত হয়েছিল তারা আবার স্বধর্মে ফিরে আসে। ঘটনা প্রকাশ্যে আসতেই সেকুলারবাদীরা হৈ চৈ শুরু করে দেয়। দেশজুড়ে বিতর্ক শুরু হয়। বিরাট হিন্দু সম্মেলন থেকে হিন্দু সমাজের সাধুসন্তরা যারা ইসলাম ও খৃস্টানদের দ্বারা ভয় ও প্রলোভনে ধর্মান্তরিত হয়েছে তাদের স্বধর্মে ফিরে আসার আহ্বান জানান। সেই সঙ্গে ধর্মান্তর বিরোধী বিল পাশ করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে চাপ সৃষ্টি করে। পরিষদের রত্নাগিরির আর এক সন্ত নরেন্দ্র মহারাজ বলেন, হিন্দু সমাজ সহনশীল হওয়ায় খৃস্টান ও মুসলমানরা খুব সহজেই অনেক হিন্দুকে ধর্মান্তরিত করেছে। কিন্তু এখন আবার হিন্দুরা আবার স্বধর্মে ফিরতে শুরু করেছে। এটাকে ধর্মান্তর বলা সেকুলারবাদীদের একটা চক্রান্ত। হিন্দুরা স্বেচ্ছায় স্বধর্মে ফিরে আসছে, তাই এর নাম পরাবর্তন।

বিরাট হিন্দু সম্মেলনে জৈন ও বৌদ্ধধর্মের প্রতিনিধিরাও ছিলেন। জৈনমুনি বিনম্র সাগর বলেন, যে হিন্দুরা অন্যধর্মে চলে গিয়েছিল তাদের আবার স্বধর্মে ফিরিয়ে নেওয়া উচিত। সম্মেলনের মঞ্চ থেকে ধর্মান্তরকরণ ও গো-হত্যা বন্ধ, হিন্দুদের মধ্যে একতা, রামজন্মভূমিতে মন্দির নির্মাণ বিষয়ে বক্তব্য রাখা হয়। ভোপালের সন্ন্যাসিনী সাধ্বী সরস্বতী লাভ-জেহাদের বিপদ সম্পর্কে হিন্দুদের সচেতন করেন।

সম্মেলনে কাঞ্চীকামকোটি পীঠের শঙ্করাচার্য জয়েন্দ্র সরস্বতী মহারাজ ও বিশ্ব হিন্দু পরিষদের প্রবীণ কার্যকর্তা অশোক সিংহলও উপস্থিত ছিলেন।



'বিল্লদাকুঞ্জ'
কালিকাপুর, বোলপুর, জেলা : বীরভূম
ফোন : ০৩৪৬৩ ২৫২৪৪৭
মো : ৯৪৩৪৩০৬৭৯৬ / ৯২৩৩১৮৯১৭৯

শক্তিশালী ভারত গড়তে শরণার্থী ও অনুপ্রবেশ সমস্যার আশু সমাধান প্রয়োজন

অসিত বরণ ঠাকুর

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী স্বচ্ছ ও শক্তিশালী ভারত গড়ার ডাক দিয়েছেন। তাঁর প্রাক-নির্বাচনী বক্তৃতায় উদ্বাস্তু ও অনুপ্রবেশের মতো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এক জটিল সমস্যার কথা উল্লেখ করে তার



ফাইল চিত্র

সমাধান করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। আমরা আশা করবো সেই দুই সমস্যার সমাধানকল্পে তিনি দৃঢ় পদক্ষেপ গ্রহণে বিলম্ব করবেন না। বস্তুত বহুল প্রচারিত এই সমস্যার আশু সমাধানের উপরই শক্তিশালী ভারত গঠন নির্ভর করছে।

ইতিমধ্যে ভারতে বসবাসকারী বাংলাদেশী উদ্বাস্তুরা নাগরিকত্বের দাবিতে সুপ্রিম কোর্টে এক মামলা দায়ের করেছেন বলে খবরে প্রকাশ। সুপ্রিম কোর্ট সেই মামলায় কেন্দ্র ও সমস্ত রাজ্য সরকারের মতামত চেয়ে এক নির্দেশও জারি করেছেন। আগামী ১০ ডিসেম্বর ২০১৪-তে শুনানি হয়েছে। মামলায় দাবি করা হয়েছে যে 'শরণার্থী মানে অনুপ্রবেশকারী নয়'। ধর্মের ভিত্তিতে দেশভাগের বলি হয়েই তাঁরা আসতে বাধ্য হয়েছেন। জন্মগত ও ঐতিহাসিক কারণে ভারতে আসা ও স্থায়ীভাবে বসবাসের অধিকারী তাঁরা। আইনজীবী শান্তিরঞ্জন দাশ 'জয়েন্ট অ্যাকশন কমিটি ফর বেঙ্গলি রিফিউজি'-র পক্ষে এই মামলা লড়ছেন।

একই দাবিতে 'স্বজন' নামের এক এনজিও-র আবেদনে সুপ্রিম কোর্টের মামলায় মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান জানিয়েছিলেন যে, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর লোকসভার প্রাক-নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি মতো পাঁচ হাজারেরও বেশি বাংলাদেশী সংখ্যালঘু শরণার্থীদের নাগরিকত্ব ও পুনর্বাসন দিয়েছেন। অসম সরকারও অনুরূপভাবে উদ্বাস্তুদের নাগরিকত্বের পক্ষে কোর্টে বলেছেন। পশ্চিমবঙ্গ কি বলেছে তা অবশ্য জানা যায়নি।

ভারতে আগত ২ কোটিরও বেশি বাংলাদেশী সংখ্যালঘু উদ্বাস্তু বেনাগরিক হয়ে সমস্ত রকম অধিকার বঞ্চিত হয়ে মানবেতর জীবন-যাপন করতে বাধ্য হচ্ছেন। আর্থিক, রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক অত্যাচার, শোষণ ও হয়রানির শিকার হতে হচ্ছে তাদের। বহু আবেদন-নিবেদনেও এর সুরাহা হচ্ছে না। এর সঙ্গে 'অনুপ্রবেশকারী'র সংখ্যাও লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে। বাংলাদেশী সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের লোকরা আর্থিক কারণ ছাড়াও ধর্মীয় ও জেহাদি সন্ত্রাস সৃষ্টির কারণে ভারতে ঢুকছে। এদের সংখ্যা প্রায় ১ কোটি বলে জানা যাচ্ছে। ভারতের 'উদ্বাস্তু' ও অনুপ্রবেশ' সমস্যা এখন আর অবহেলার বিষয় নয়। এর একটা সুষ্ঠু সমাধান প্রয়োজন। উদ্বাস্তু ও 'অনুপ্রবেশ' পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত।

অনুপ্রবেশ বন্ধ করতে গেলে যেমন ভারত-বাংলাদেশের সুসম্পর্ক প্রয়োজন তেমনই উদ্বাস্তু সমস্যার স্থায়ী সমাধান প্রয়োজন মানবিক ও আইনি প্রক্রিয়ায়। তাছাড়া 'অনুপ্রবেশকারী' চিহ্নিত ও ফেরত পাঠাতে গেলে 'উদ্বাস্তু'দের নাগরিকত্ব প্রদানই প্রাথমিক পদক্ষেপ হওয়া উচিত। নচেৎ চিহ্নিতকরণই সম্ভব হবে না। উদ্বাস্তু ও অনুপ্রবেশ এখন ভারতের এক গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় জ্বলন্ত সমস্যা। এই দুই সমস্যা দেশের অভ্যন্তরীণ আর্থ-সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক অস্থিরতা এবং দেশের অখণ্ডতা ও সার্বভৌমত্ব বিপন্ন করার কারণ হিসাবে দেখা দিচ্ছে।

রাষ্ট্র সঙ্ঘের উদ্বাস্তু হাইকমিশন (UNHCR)-এর প্রদত্ত 'উদ্বাস্তু' (Refu-

gee) সংজ্ঞায় বলছে— ''জাতি, ধর্ম, বর্ণ, সংস্কৃতি বা রাজনৈতিক বিশ্বাসের ভিত্তিতে অত্যাচারিত হতে পারে এ রকম আশঙ্কা থেকে যে ব্যক্তি নিজের দেশ ছেড়ে অন্য দেশে চলে এসেছেন, সেই ব্যক্তি শরণার্থী বা উদ্বাস্তু।'' (রাষ্ট্রসঙ্ঘ সিদ্ধান্ত নং ৪২৮(৫) তাং ১৪.১২.১৯৫০)। পরবর্তীতে অবশ্য কিছু সংশোধন হয়েছে। সুতরাং আন্তর্জাতিক নিয়ম অনুসারেও ভারতে আগত ধর্মীয়ভাবে অত্যাচারিত বাংলাদেশী হিন্দুরা ভারতে উদ্বাস্তু অধিকার এবং ফিরে না যেতে চাইলে নাগরিকত্ব পাওয়ার অধিকারী। কিন্তু আর্থিক বা অন্য কারণে আসা বাংলাদেশীরা (মুসলমান) 'অনুপ্রবেশকারী' হিসাবেই গণ্য হয়ে নিজ দেশে ফেরত যেতে বাধ্য। রিফিউজিদের জন্য ১৯৫১ সালের ইউএন কনভেনসন বা ১৯৬৭ সালের প্রোটোকলে ভারত সই না করলেও সরকার জাতীয় নেতাদের দেয় দেশ-ভাগজনিত প্রতিশ্রুতি বা মানবিকতা ও নৈতিকতার দায়বদ্ধতাকে অস্বীকার করতে পারে না।

বাংলাদেশ সৃষ্টির আগে পর্যন্ত সংবিধান ও নাগরিকত্ব আইন ১৯৫৫-এর আইন মোতাবেক পূর্ব পাকিস্তান থেকে আগত সংখ্যালঘু হিন্দু, বৌদ্ধ, খৃস্টান ও শিখদের ভারতীয় নাগরিকত্ব পাওয়ার ব্যবস্থা ছিল। উদ্বাস্তু অধিকারের দৌলতে সরকারি সাহায্য ও পুনর্বাসনও মিলত। তবে পশ্চিম পাকিস্তানি উদ্বাস্তুদের বিশেষ কিছু আইন প্রণয়ন করে অনৈতিকভাবে বাড়তি সুবিধা দেওয়া হত। কিন্তু হঠাৎ করে কোনো ন্যায়সঙ্গত কারণ ছাড়াই কেন্দ্রীয় সরকারের নং ২৬০১১/১৬/৭১/আই. সি তাং ২৯.১১.১৯৭১-এর আদেশবলে ২৫ মার্চ, ১৯৭১, সালের পরে আগত বাংলাদেশী উদ্বাস্তুদের নাগরিকত্ব দিতে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয় ইন্দিরা-মুজিব চুক্তির মিথ্যা অজুহাতে। ১৯৭৫ সালের মুজিব হত্যার পরবর্তীতে বাংলাদেশের ধর্মনিরপেক্ষ সংবিধান বর্জিত হয়ে সংখ্যালঘু অত্যাচারের ব্যাপকতা বৃদ্ধিতেও সেই অন্যায় নিষেধাজ্ঞা বাতিল না হওয়ায় ভারতে হিন্দু উদ্বাস্তু সংখ্যা বৃদ্ধি হতে শুরু করে। সেই সুবাদে অনুপ্রবেশও সমানতালে চলতে থাকে অবাধ গতিতে।

পূর্বতন এনডিএ সরকার নাগরিকত্ব (সংশোধন) আইন-২০০৩ অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গে ডিসেম্বর ২০০৩-এ পাশ করে ২০০৪ সালে নির্বাচনে যায়। সেই সময় তৎকালীন বিরোধী দলনেতা ড. মনমোহন সিং ও নির্দল সাংসদ জেনারেল (অবঃ) শঙ্কর রায়চৌধুরীর বাংলাদেশী উদ্বাস্তুদের নাগরিকত্ব দেওয়ার আইনি ব্যবস্থার দাবিকে নৈতিক সমর্থন দিয়েও তৎকালীন উপপ্রধানমন্ত্রী এল. কে. আদবানী কিন্তু করেননি। উল্লেখ্য এনডিএ ক্ষমতায় থাকাকালীন নাগরিকত্ব বিধি, ২০০৪ দ্বারা গুজরাট ও রাজস্থানের উদ্বাস্তুদের নাগরিকত্বের ব্যবস্থা করেন। কিন্তু বাংলাদেশী উদ্বাস্তুরা ন্যায়বিচার বঞ্চিত থেকে যায়। উদ্বাস্তুদের সংখ্যা ক্রমবর্ধমান হলেও পরবর্তীতে ড. মনমোহন সরকার দীর্ঘ ১০ বৎসরেও তাঁর নিজের তোলা দাবিকে অনেক আবেদন- নিবেদনেও কিছু করলেন না। এই অবজ্ঞা ও অমানবিকতায় বাঙালি জাতিকে আর একবার বঞ্চিত করা হলো। বাঙালির প্রতি বঞ্চনার ইতিহাস দীর্ঘায়িত হলো।

২০০৩ সালের নাগরিকত্ব (সংশোধন) আইন, ২০০৩-এ কি আছে তা দেখা যাক।

(১) ২(১) বি নতুন ধারায় বলা হয়েছে যে— ''যে কেনো বিদেশি, যে বা যারা পাশপোর্ট বা অনুরূপ কোনো বৈধ অনুমতিপত্র ছাড়া ভারতে এসেছেন/ঢুকছেন, তারা প্রত্যেকেই 'অনুপ্রবেশকারী'। ---ভিসার মেয়াদ ফুরালেও অনুপ্রবেশকারী। অর্থাৎ এতে উদ্বাস্তু ও অনুপ্রবেশকারী একই পংক্তিতে বিচার হবে। এই ধারা বলে কী কোনো উদ্বাস্তু আর নাগরিকত্ব ও পাওয়ার অধিকারী হবেন না। চিরদিনই তিনি অনুপ্রবেশকারী থাকবেন তা ৪০/৫০ বৎসর আগে এলেও। অর্থাৎ উদ্বাস্তুদের দেওয়া কংগ্রেস, গান্ধীজী, নেহেরু বা প্যাটেলের পূর্বপ্রতিশ্রুতি এক খোঁচায় নস্যাৎ করা হলো। এ এক অমানবিক ব্যবস্থা।

ব্যাপক অবৈধ অনুপ্রবেশের পরিণতিতে আজ পূর্বভারত তথা সারা দেশ বিপদগ্রস্ত, ব্যতিব্যস্ত ও দিশেহারা। অক্টোবরে বর্ধমানের বিস্ফোরণকাণ্ড চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়েছে অনুপ্রবেশ সমস্যাকে অবহেলা করলে কী পরিণতি হয়। বাংলাদেশের সন্ত্রাসবাদীরা রীতিমত সন্ত্রাসঘাঁটির জাল বিস্তার করে ফেলেছে পশ্চিমবাংলা, অসম ও অন্যান্য রাজ্যে।

(২) 'মা' এবং 'বাবা' দু'জনেই ভারতের বৈধ নাগরিক না হলে, কোনো শিশু ভারতে জন্মগ্রহণ করলেও সে জন্মসূত্রে ভারতীয় নাগরিকত্ব পাবে না। তবে সংশোধনীর পূর্বে জন্মালে 'বাবা' বা 'মার' যে কোনো একজন ভারতীয় নাগরিক হলে এবং বাবা বৈধভাবে থাকলে শিশু জন্মসূত্রে নাগরিক হবে।

(৩) অনুপ্রবেশকারীকে নাগরিকত্ব আইনে ৫ বৎসর জেল ও ৫০ হাজার টাকা জরিমানা করে স্বদেশ ফেরত পাঠানো হবে।

১৯৪৬ সালের বিদেশি আইনে শাস্তি তো আছেই।

'উদ্বাস্তুদের' অবৈধ অনুপ্রবেশকারীর সংজ্ঞা থেকে আলাদা করতে হবে পুনরায় আইন সংশোধন করে। এছাড়া কেন্দ্রীয় সরকারের ১৯৭১ সালের অন্যায় নির্দেশনামা বাতিল করতে হবে অনতিবিলম্বে। উদ্বাস্তুদের সহজ উপায়ে নাগরিকত্ব দেওয়ার বিশেষ আইন/বিধি চালু করে রাজ্য সরকারের মাধ্যমে নাগরিকত্ব ও পুনর্বাসন দিতে হবে। তবেই অনুপ্রবেশকারীদের খুঁজে বার করে ২০০৩-এর সংশোধিত আইনে ব্যবস্থা নেওয়া সম্ভব। অন্যথায় নয়।

বিগত লোকসভার প্রাক-নির্বাচনী প্রচার সভায় বিশেষ করে অসম ও পশ্চিমবঙ্গে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বারে বারে উদ্বাস্তু ও অনুপ্রবেশকারীর সমস্যার কথা তুলে সমাধানের কথা বলেছেন। তিনি এই দুই গুরুত্বপূর্ণ সমস্যাকে রাজনৈতিক ইস্যু করে বাস্তবতাকে স্বীকৃতি দিয়েছেন মাত্র। স্বাভাবিক কারণে কংগ্রেস, বামদলগুলি এবং তৃণমূল কংগ্রেস, যাঁরা এই দুই সমস্যাকে কাজে লাগিয়ে এতদিন ভোট রাজনীতি করে ফায়দা লুটেছেন, তাঁরা বাকরুদ্ধ হয়ে দিশেহারা হয়ে পড়েছেন। কংগ্রেসের স্থবিরত্ব ও নীতিহীনতা সবারই জানা। ছিন্নমূল উদ্বাস্তুদের অসহায়তাকে কাজে লাগিয়ে ৩৪ বৎসর ধরে রাজত্ব করা সিপিএম ও তার শরিকরা ইউপিএ ১-এর সহযোগী হয়ে হুঙ্কার ছাড়তো--- ''আমরা কেন্দ্রীয় সরকারকে উঠতে বললে উঠবে আর বসতে বললে বসবে।'' অথচ উদ্বাস্তুদের নাগরিকত্ব দেওয়ার দাবি কোনোদিন তারা তখন করেনি। তাঁরা মরিচঝাঁপির উদ্বাস্তু গণহত্যার অপরাধ স্বীকার বা অনুশোচনা আজও করেনি। ২০০৬-এর নির্বাচন পর্বে শত শত বৈধ উদ্বাস্তুদের বিদেশি আইনে জেলে পুরেছে নির্বাচনী স্বার্থে। এখন তাঁরা বেসামাল হয়ে উদ্বাস্তু-নাগরিকত্ব দাবিতে উত্তর ২৪ পরগনায় আন্দোলনের হুমকি দিচ্ছে। চক্ষুলজ্জাও নেই তাঁদের। ক্ষমতাচ্যুত হলেই উদ্বাস্তু ও গরিবের কথা মনে পড়ে বৈকি।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বাম অপশাসন, অত্যাচার ও অনুন্নয়নকে হাতিয়ার করে, উদ্বাস্তু আন্দোলনে উঠে আসা ঠাকুরনগরের মতুয়া ও অন্যান্য উদ্বাস্তু সংগঠনের ভাবাবেগকে কাজে লাগিয়ে, মরিচঝাঁপি উদ্বাস্তু গণহত্যা ও অন্যান্য বহু হত্যার তদন্ত করে অপরাধীদের শাস্তি ও ক্ষতিপূরণের প্রতিশ্রুতি দিয়ে ক্ষমতাসীন হয়েছেন। মরিচঝাঁপি- গণহত্যার বিচার বিভাগীয় তদন্তাদেশ বিধানসভায় ঘোষণা করেও তিনি কিছু করলেন না। মরিচঝাঁপি ক্ষতিগ্রস্তদের পুনর্বাসনের জমি দেওয়ার ঘোষণা করেও তিনি দেননি। ২০১০ সালের ২৮ ডিসেম্বরের কলকাতায় উদ্বাস্তুদের নাগরিকত্বের দাবিতে অনুষ্ঠিত মহাসম্মেলনে নাগরিকত্ব দেওয়ার সর্বদলীয় প্রতিশ্রুতি পালনের চেষ্টা আজও তৃণমূল সরকার করেনি। সদ্য ক্ষমতাচ্যুত কংগ্রেস তো প্রতিশ্রুতি পালনে অদক্ষতা দেখাতেই অভ্যস্ত। মতুয়া মহাসঙ্ঘ ও তাঁদের ঘাঁটি ঠাকুরনগরের ঠাকুরবাড়িকে মমতাদেবী গ্রাস করেছেন অর্থ ও ক্ষমতার হাতছানি দিয়ে। ধর্মস্থানকে রাজনৈতিকভাবে ব্যবহার ভয়াবহ হতে বাধ্য। ক্ষমতার দ্বন্দ্বে ঠাকুরবাড়ি আজ গৃহযুদ্ধে সামিল।

পাঞ্জাবের স্বর্ণমন্দিরের ব্লু-স্টার অপারেশনের কথা কেউ ভোলেনি আজও। পরিণতির জন্য মমতাদেবীকেই দায়িত্ব নিতে হবে। মতুয়াদের সংহতি বিপন্ন হওয়ায় তাদের সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রাসঙ্গিকতাও আজ তলানিতে। ঠাকুরবাড়ির লোকেদের রাজনীতিতে প্রবেশে মতুয়ানীতি আজ প্রশ্নের মুখে। ধর্মীয় আন্দোলনে ব্যাঘাত ঘটছে। তারা উদ্বাস্তুদের জন্য নাগরিকত্বের দাবিও আর তুলতে পারছে না তৃণমূল সরকার যুক্ত হওয়াতে। তাছাড়া উদ্বাস্তু মন্ত্রী তো ঠাকুরবাড়ির লোক।

ব্যাপক অবৈধ অনুপ্রবেশের পরিণতিতে আজ পূর্বভারত তথা সারা দেশ বিপদগ্রস্থ, ব্যতিব্যস্ত ও দিশেহারা। অক্টোবরে বর্ধমানের বিস্ফোরণকাণ্ড চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়েছে অনুপ্রবেশ সমস্যাকে অবহেলা করলে কী পরিণতি হয়। বাংলাদেশের সন্ত্রাসবাদীরা রীতিমত সন্ত্রাসঘাঁটির জাল বিস্তার করে ফেলেছে পশ্চিমবাংলা, অসম ও অন্যান্য রাজ্যে। খবরে প্রকাশ, প্রায় ৬৫টি সন্ত্রাসবাদী ঘাঁটি সারা রাজ্যে ইতিমধ্যে তৈরি হয়েছে। বাংলাদেশ ও ভারত দুইদেশই এই সন্ত্রাসবাদীদের লক্ষ্য। ধর্মীয় মৌলবাদীরা জেহাদি সন্ত্রাসে বিশ্বাসী। এদের সমূলে উৎপাটন প্রয়োজন। কেন্দ্রীয় সরকার এবং পূর্বতন বাম ও তৃণমূল কংগ্রেস সরকার এই দায় কোনোভাবেই অস্বীকার করতে পারে না।

আমাদের অপেক্ষা করতে হবে একক সংখ্যাগরিষ্ঠ মোদী সরকার কবে ও কীভাবে এই দুই বহুল চর্চিত উদ্বাস্তু ও অনুপ্রবেশকারী সমস্যার সমাধানে আর্থিক, প্রশাসনিক, রাজনৈতিক, কূটনৈতিক ও আইনানুগ ব্যবস্থা নেয়। বিজেপি-র বিগত লোকসভা নির্বাচনী ইস্তাহারের ৪০নং পাতায় লেখা প্রতিশ্রুতিকে স্মরণ করিয়ে দিয়ে শেষ করবো। যথা— ''India shall remain a natural home for persecuted Hindus and they shall be welcome to seek refuge here.'' অর্থাৎ ''ভারত উৎপীড়িত হিন্দুদের সাধারণ আবাস হিসাবেই বিবেচিত হবে। এদেশে তারা সবসময়েই স্বাগত।''

(লেখক পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রাক্তন যুগ্ম স্বরাষ্ট্র সচিব)

জাতীয়তাবাদী বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক

স্বস্তিকা

পড়ুন ও পড়ান

প্রতি কপি মূল্য ১০.০০ টাকা

বার্ষিক গ্রাহকমূল্য ৪০০ টাকা

একনজরে বিশ্ব হিন্দু পরিষদ

সারা বিশ্বে ভারত একদা জ্ঞান-বিজ্ঞান ও আর্থিক সম্পন্নতার নিরিখে প্রথম স্থানে ছিল। কিন্তু বিগত কয়েক শতাব্দী বিদেশিদের পদানত থাকার জন্য অনেক রকম কুফল ভোগ করতে হয়েছে। এদেশের পুত্ররূপ হিন্দুসমাজ আজও নিজেদের সাংস্কৃতিক ও আধ্যাত্মিক স্বাধীনতার জন্য সংঘর্ষ করে চলেছে। প্রায় এক হাজার বছরের পরাধীনতা, দাসত্ব এবং অপমান সহ্য করে ১৯৪৭ সালে দেশ খণ্ডিত করে রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভ করেছে। কিন্তু এতদ্‌সত্ত্বেও দেশে গো-হত্যা বন্ধ হয়নি, ধর্মান্তরকরণ আজও চলছে। মঠ-মন্দির, সাধু-সন্ত, মাতৃজাতি এবং ধর্মীয় যাত্রার উপর হামলা বন্ধের নাম নেই। ধর্মনিরপেক্ষতার নামে নানারকম অত্যাচার হিন্দুসমাজ সহ্য করছে।

বিশ্ব হিন্দু পরিষদের প্রতিষ্ঠা

সংবাদসংস্থা 'হিন্দুস্থান সমাচার'-এর প্রতিষ্ঠাতা শিবশঙ্কর আপ্তে উপাখ্য দাদাসাহেব আপ্তে দেশের এই উদ্বেগজনক পরিস্থিতি নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করছিলেন। তিনি তাঁর চিন্তা-ভাবনার কথা রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের তৎকালীন সরসঙ্ঘচালক শ্রীগুরুজী (এম এস গোলওয়ালকর)-কে জানালেন। শ্রীগুরুজী আগে থেকেই এ বিষয়ে চিন্তিত ছিলেন। শ্রীগুরুজী ও আপ্তে এজন্য এক বিশ্বস্তরীয় সম্মেলনের কথা ভাবছিলেন। হিন্দু মহাসভার তৎকালীন সম্পাদক শ্রী বি জি দেশপাণ্ডে এই সময় শ্রীগুরুজীর সঙ্গে দেখা করেন। শ্রীগুরুজী তাঁকে বলেন, বিশ্বস্তরে হিন্দুদের পরিষদ গঠনের এই কাজ কোনোও রাজনৈতিক দলের



১৯৬৪, বিশ্ব হিন্দু পরিষদের প্রতিষ্ঠা। রয়েছেন গুরুজী ও চিন্ময়ানন্দ।

করা উচিত নয়। তাহলে তার উদ্দেশ্য সীমিত হয়ে পড়বে। এই সময় ত্রিনিদাদে হিন্দুদের প্রতিনিধি হিসাবে সে দেশের সাংসদ ড. শম্ভুনাথ কপিলদেব ভারত সরকারের সঙ্গে কথাবার্তা বলার জন্য এদেশে এসেছিলেন। কিন্তু ভারত সরকারের দৃষ্টিভঙ্গি দেখে তিনি হতাশ হন। এরপর তিনি শ্রীগুরুজীর সঙ্গে দেখা করে নিজেদের দেশের হিন্দুদের সমস্যার কথাগুলি তুলে ধরেন।

এই সময় মুম্বইয়ের স্বামী চিন্ময়ানন্দ সারা বিশ্বে হিন্দু সংস্কৃতি প্রচার-প্রসারের কাজ করছিলেন। তিনিও বিশ্বময় হিন্দুদের এক সম্মেলনের প্রয়োজনের কথা অনুভব করছিলেন। এভাবে বিভিন্ন মানুষ যখন বিশ্বব্যাপী এক হিন্দু সংগঠনের ভাবনাচিন্তা করছিলেন তখন এ বিষয়ে প্রাথমিক আলোচনার জন্য শ্রীগুরুজী বিদেশস্থ প্রায় ৪০ জন ব্যক্তি, সংস্থা এবং ভারতের ২০০ জন বিশিষ্ট ধর্মীয় নেতা ও চিন্তাবিদের সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে সাক্ষাৎ করার জন্য শ্রী আপ্তেকে নিযুক্ত করেন। এইসব ভাবনাচিন্তা ও প্রয়াসের ফলে দেশের তৎকালীন পরিস্থিতি এবং হিন্দুসমাজের উপর ক্রমবর্ধমান আক্রমণকে লক্ষ্য রেখে দেশের প্রমুখ সাধুসন্ত, মহাত্মা, সমাজশাস্ত্রবিদ্ এবং বিদ্বান ব্যক্তিবর্গ ১৯৬৪ খৃস্টাব্দে পবিত্র জন্মাষ্টমীর শুভ মুহূর্তে মুম্বই-এর মহর্ষি সন্দীপনী মুনির আশ্রমে বিশ্ব হিন্দু পরিষদ প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। ওই ঐতিহাসিক অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন স্বামী চিন্ময়ানন্দ (প্রতিষ্ঠাতা চিন্ময় মিশন), সুপ্রসিদ্ধ জৈন মুনি সুশীল কুমার, গোরক্ষপুর গীতা প্রেসের প্রতিষ্ঠাতা হনুমান প্রসাদ পোদ্দার, শিখ সমাজের মাস্টার তারা সিং, জ্ঞানী ভূপিন্দর সিং, কে এম মুন্সী প্রমুখ বিদ্বান ও প্রবীণ সাধুসন্ত এবং রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের তৎকালীন সরসঙ্ঘচালক মাধব সদাশিব গোলওয়ালকর (যিনি শ্রী গুরুজী নামেই সবিশেষ পরিচিত ছিলেন)। এঁদের প্রেরণায় বীজরূপে প্রোথিত অঙ্কুর আজ বিশ্বের মধ্যে বিশাল বটবৃক্ষে পরিণত হয়েছে। সমাজ-জাগরণ, সংস্কৃতি তথা ধর্মের সংরক্ষণ, সামাজিক সদ্ভাব ও একাত্মতা (সামাজিক সমরসতা) প্রভৃতি বিষয়ে সুদীর্ঘ পঞ্চাশ বছর ধরে নিরন্তর সাধনা ও সমাজের অকৃপণ সহযোগিতার ফলে বিশ্ব হিন্দু পরিষদ বর্তমানে ভারতে এবং বহির্ভারতে এক বিশিষ্ট পরিচয় ও সুনাম অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে।

সময়ের আহ্বান ও আবশ্যকতা অনুসারে সময়ে সময়ে বিভিন্ন আয়াম বা বিভাগও যুক্ত হয়েছে। যেমন— যুবসমাজের জন্য বজরঙ্গ দল ও দুর্গাবাহিনী গঠিত হয়েছে। মাতৃমণ্ডলীর জন্য মাতৃশক্তি নামে পৃথক

CET

CALCUTTA EXPRESS TRANSPORT CO. (REGD.)

6, Peter Lane,
Kolkata - 700 073
Phone : 2237-8010 / 9497, 2225-8883

With Best Compliment -

Ecomoney Insurance Brokers Pvt. Ltd.

AQ-7, Sector-V
Salt Lake City
Kolkata - 700 091

মকর সংক্রান্তি উৎসবের শুভক্ষণে
বনবাসী বন্ধুদের সাহায্যার্থে
বস্তু এবং অর্থ দিয়ে সাহায্য করুন।



পূর্বাঞ্চল কল্যাণ আশ্রম

১৬১/১ এম জি রোড, রুম নং ৫১
বাঙ্গুর বিল্ডিং, সেকেন্ড ফ্লোর, কলকাতা-৭
ফোন : ২২৬৮০৯৬২, ২২৭৩৫৭৯২
E-mail : kalyanashram.kol@gmail.com

হিন্দু সবাই ভাই-ভাই

সৌজন্যে

সৈকত বক্সী

সভাপতি, ভারতীয় জনতা পার্টি
দক্ষিণ কলকাতা

সংগঠন রচনা করা হয়েছে। নিত্য, নিয়মিত সৎসঙ্গ-কে পরিষদের কাজের মূলভিত্তি বলে পরিগণিত করা হয়েছে। এছাড়া ক্রমশ ধর্মপ্রসার, মঠ-মন্দির, সংস্কার, সন্ত-সম্পর্ক, অর্চক-পুরোহিত প্রশিক্ষণ ও সংগঠন, সেবা, সংস্কৃত ভাষার উন্নয়ন ও অনুশীলন, যোগ ও বেদ শিক্ষা, সমন্বয়, সামাজিক সমরসতা, বিশেষ জনসম্পর্ক, বিদেশ বিভাগ, ধর্মযাত্রা মহাসঙ্ঘ, সাংস্কৃতিক গৌরব সংস্থান, গ্রাম শিক্ষা মন্দির ও প্রচার-প্রসারের মতো আয়ামও যুক্ত করা হয়েছে।

বিরাট হিন্দু-সম্মেলন

হিন্দু সমাজের বিভিন্ন মত-পন্থ-সম্প্রদায়ের মধ্যে পরস্পর সমন্বয় বজায় রাখার জন্য মধ্যযুগে বিলুপ্ত হিন্দু সম্মেলনের মতো বিশ্ব হিন্দু সম্মেলন করা, দেশের বিশিষ্ট ও প্রমুখ ধর্মাচার্যদের নিয়ে নিয়মিত ধর্মসংসদের আয়োজন এবং তাঁদের পথনির্দেশ নেওয়া চলছে। বিশ্ব হিন্দু পরিষদ পূজ্য শঙ্করাচার্য এবং পূজনীয় সন্তদের এক মঞ্চে এনে তাঁদেরই পথনির্দেশে জাতপাতের ভিত্তিতে বহুবিভক্ত সমাজে সমতা ও একাত্মতার পরিবেশ নির্মাণ করে সামাজিক বৈষম্য দূর করার কাজ নিরন্তরভাবে করে চলছে। সেজন্য পরিষদের ধ্যেয়বাক্য হলো--- 'হিন্দবঃ সোদরাঃ সর্বে, ন হিন্দুর্পতিতো ভবেৎ'। 'হিন্দু হিন্দু এক রহে, ভেদভাব কো নহী সহে'। এই উদ্‌ঘোষ বাক্য বিভিন্ন সম্মেলনে সন্তদের দ্বারাই ঘোষণা করা হয়েছে। বিশ্ব হিন্দু পরিষদ ছিন্নবিচ্ছিন্ন হিন্দু সমাজকে একসূত্রবদ্ধ করার ভগীরথ প্রয়াস সদা সর্বদা করে চলেছে।

পরাবর্তন

ধর্মান্তরকরণের বিষাক্ত অপপ্রয়াসকে মোকাবিলা করার জন্য সমাজ জাগরণ ও 'সংস্কৃতি রক্ষা যোজনা' কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে। এই প্রকল্পে এযাবৎ ছয় লক্ষাধিক বন্ধুরা পরাবর্তনের মাধ্যমে পুনরায় স্বধর্মে ফিরে এসেছেন। অন্ততপক্ষে আরও চল্লিশ লক্ষ বন্ধুদেরকে ধর্মান্তর থেকে বিরত করা গেছে।

একাত্মতা যজ্ঞযাত্রা-১৯৮৩

একতার সূত্রে সারাদেশকে ঐক্যবদ্ধ করার জন্য প্রথম একাত্মতা যজ্ঞযাত্রার আয়োজন হয়। মূল দুটি রথ যাত্রা করে।



বিশ্ব হিন্দু পরিষদের সুবর্ণ জয়ন্তী বর্ষ। মুম্বাই, ২০১৪

একটি গঙ্গাসাগর থেকে সোমনাথ এবং অপরটি হরিদ্বার থেকে কন্যাকুমারী। ১৯৯৫-এ দ্বিতীয় একাত্মতা যাত্রায় দশ কোটি ভারতবাসী এবং তিন লক্ষাধিক গ্রামে সম্পর্ক স্থাপিত হয়।

শ্রীরামজন্মভূমি মুক্তি আন্দোলন

এই আন্দোলন শুরু হয়েছিল ১৯৮৪ সালে। দীর্ঘ আন্দোলনের ফলে মন্দিরের মূল দ্বারের তালা খোলা হয় ১৯৮৬ সালে। তারপর শ্রীরামশিলা পূজন, শ্রীরামজ্যোতি যাত্রা, শ্রীরামপাদুকা যাত্রা প্রভৃতি কার্যক্রমে ব্যাপক জনজাগরণ হয়। শেষ পর্যন্ত ১৯৯২ সালের ৬ ডিসেম্বর শ্রীরামজন্মভূমিতে স্থিত বাবরিধাঁচা ধূলিসাৎ হয়। ২০১০ সালের ৩০ সেপ্টেম্বর এলাহাবাদ হাইকোর্টের লক্ষ্ণৌ বেঞ্চের তিন মহামান্য বিচারপতি তাঁদের রায়ে একবাক্যে ওই স্থানকে শ্রীরামজন্মভূমি বলে মান্যতা প্রদান করেন।

সুন্দর মনোরম মন্দির নির্মাণের প্রয়াস চলছে। ইতিমধ্যে অযোধ্যার সাংস্কৃতিক সীমানার মধ্যে কোনোরকম ইসলামিক প্রতীক নির্মাণের বিরোধিতা করে সাধুসন্তদের ৮৪ ক্রোশ পরিক্রমার আয়োজন করা হয়েছিল।

গো-রক্ষার জন্য জনজাগরণ ও সাফল্য

ব্যাপক জনজাগরণ ও আন্দোলনের মাধ্যমে দশ লক্ষ গোরু কসাই-এর হাত থেকে মুক্ত করা হয়েছে। সারা দেশে ৩৫০টি নতুন গো-শালা খোলা হয়েছে। নাগপুরের দেউলাপার-সহ বিভিন্ন গো-শালাকে কেন্দ্র করে ৩০০টি গো-বিজ্ঞান গবেষণা কেন্দ্র এবং ৪০০টি জৈবিক সার উৎপাদন কেন্দ্র শুরু হয়েছে।

বুড়ো অমরনাথ যাত্রা

জম্মু-কাশ্মীরের পুঞ্চ-রাজৌরি এলাকায় পাকিস্তানি অনুপ্রবেশের ফলে হিন্দুদের সংখ্যা ক্রমশ কমছে। হিন্দুরা এখন একেবারে নগণ্য। হিন্দুদের মনোবল বাড়ানোর জন্য ২০০৫ থেকে বজরঙ্গ দলের মাধ্যমে প্রতি বছর বুড়ো অমরনাথ যাত্রা আরম্ভ হয়েছে। যাত্রা চলছে।

রামসেতু রক্ষা আন্দোলন

২০০৭ সালে কেন্দ্র সরকারের রামসেতু

ভাঙার ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে ওই বছরের ১২ সেপ্টেম্বর দেশব্যাপী রাস্তায় রাস্তায় 'চাকা জ্যাম' (রোড ব্লক) এবং ৩০ ডিসেম্বর দিল্লীর জাপানি পার্কে ১৫ লক্ষ হিন্দুর সমাবেশ হয়। ফলে ঐতিহাসিক রামসেতু ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা পায়। ভারত সরকার হজযাত্রীদের (মুসলমানদের) ভরতুকি এবং মক্কা যাতায়াতের পথে থাকা-খাওয়ার জন্য হজ হাউস নির্মাণ করে চলেছে। অথচ বাবা অমরনাথ যাত্রীদের সুবিধার জন্য হাইকোর্টের আদেশে প্রাপ্ত মাত্র ১০০ একর জমিও বিচ্ছিন্নতাবাদীদের (পড়ুন মুসলমানদের) চাপে ফেরত নিয়ে নিয়েছিল। ৬৪ দিনের লাগাতার আন্দোলন, ৮ লক্ষ শিবভক্তদের গ্রেপ্তার বরণের ফলে ওই জমি সরকার ফেরত দিতে বাধ্য হয়।

ভারত বাদেও পৃথিবীর ৮০টি দেশে বসবাসরত হিন্দুদের জাগরণ ও সংগঠিত করার জন্য কাজ চলছে। আমেরিকা, ডেনমার্ক, হল্যান্ড- নেদারল্যান্ড, ইংল্যান্ড, জার্মানি, কানাডা, নিউজিল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া, কেনিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা, তানজানিয়া প্রভৃতি দেশে হিন্দু সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। বর্তমানে পৃথিবীর ৮০টি দেশে সম্পর্ক এবং ৩০টি দেশে প্রত্যক্ষ সাংগঠনিক কাজ রয়েছে। ওয়ার্ল্ড হিন্দু ইকনমিক ফোরাম-এর মাধ্যমে বড় বড় দেশে 'হিন্দু ইকনমি' নিয়ে চর্চা ও গবেষণা চলছে। ৫১ হাজার **একল বিদ্যালয়** (ওয়ান টিচার স্কুল) এবং ছয় হাজার অন্যান্য সেবাকাজের মাধ্যমে পাহাড়-বন-গিরিকন্দরে বসবাসরত সমাজের পশ্চাৎপদ ভারতবাসী শিশু ভাই-বোনদের শিক্ষা ও সংস্কার প্রদান করার কাজ দ্রুতগতিতে চলছে। বনবন্ধু পরিষদ একল বিদ্যালয়ের সংখ্যা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এক লক্ষ করার পরিকল্পনা করেছে। এছাড়াও ১৩৩টি বিদ্যালয়, ১৫৪টি ছাত্রাবাস, ৪৪টি অনাথালয়, ১১৫০ নিঃশুল্ক চিকিৎসা কেন্দ্র, ৩৪৫টি স্বাবলম্বন কেন্দ্র (ভোকেশনাল ট্রেনিং সেন্টার), শত শত গ্রামে সামাজিক কুরীতি ও নেশামুক্তির জন্য অভিযান চলছে। লক্ষ লক্ষ ভারতবাসী এর সুফল পাচ্ছে। হিন্দু হেল্প লাইন এবং ইন্ডিয়া হেল্প লাইন-এর মাধ্যমে পীড়িত ও বিপদগ্রস্তদের সহায়তা করার কাজ দেশের ৮০০টি (সাংগঠনিক) জেলাতে শুরু হয়েছে। বাড়ি বাড়ি গিয়ে অভিজ্ঞ চিকিৎসকের দ্বারা কুশল চিকিৎসা নিঃশুল্ক এবং ন্যূনতম মূল্যে করানোর কাজ চলছে।

উপরোক্ত বিষয় ছাড়াও প্রাকৃতিক বিপদে সহায়তা, সন্ত্রাসবাদ এবং রাষ্ট্রবিরোধী শক্তির মোকাবিলা, রাষ্ট্রীয় অপমান মুছে ফেলা, রাষ্ট্রবিরোধী কার্যকলাপের বিরোধিতা করা প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ চ্যালেঞ্জকে গ্রহণ করে পরিষদ কাজ চলছে। বিগত পঞ্চাশ বছর যাবৎ বিশ্ব হিন্দু পরিষদ এই সকল কাজ করে সমাজকে জাগ্রত করে নিজ যাত্রাপথে এগিয়ে চলেছে। বিভিন্ন সময়ে বিবিধ যাত্রা (রথ-পরিক্রমা) বের করেও সমাজ সচেতনতার প্রয়াস নিরলসভাবে চলছে। ১৯৯৫ সালে বজরঙ্গ দল সন্ত্রাসবাদীদের চ্যালেঞ্জকে স্বীকার করে নিয়ে লক্ষাধিক শিবভক্তকে নিয়ে বাবা অমরনাথ যাত্রা নির্ভীকভাবে সম্পন্ন করে। অনেক হিন্দু ধর্মস্থানকে বিনষ্ট হওয়া থেকে পরিষদ রক্ষা করেছে। পাকিস্তান থেকে আগত হিন্দু ভাইবোনদের বসবাসের ব্যবস্থা হয়েছে। যুবক-যুবতীদের শৌর্য প্রশিক্ষণ, ব্যক্তিত্ব-বিকাশ শিবির, রক্তদান শিবির, বহুচর্চিত লাভ-জিহাদ থেকে হিন্দু যুবতীদের সসম্মান রক্ষা করে বিবাহ দেওয়ার ব্যবস্থা হয়েছে। সাংগঠনিক দৃষ্টিতে বর্তমানে সারা দেশে ৮৭২৫ প্রখণ্ড (ব্লক), ১০০০ জেলা, ২৮৮ বিভাগ, ৪৩টি প্রান্ত এবং ১২টি ক্ষেত্রে ৫৪৫৩২টি সমিতির মাধ্যমে বিশ্ব হিন্দু পরিষদ স্বীয় উদ্দেশ্য পূর্তির জন্য সতত প্রয়াসরত।

বিশ্ব হিন্দু পরিষদের সুবর্ণ জয়ন্তী যোজনা

বর্ষব্যাপী সুবর্ণ মহোৎসবের শুভারম্ভ হয়েছে প্রতিষ্ঠাস্থল মুম্বই-এ সন্দীপনী আশ্রমে, শ্রীকৃষ্ণ জন্মাষ্টমীর দিন (১৬-১৭ আগস্ট, বিক্রম সংবৎ-২০৭১)। সেইদিনই প্রতি প্রখণ্ডে (প্রতি দশ হাজার জনবসতি-কে একক ধরে) শোভাযাত্রা বেরিয়েছে।

রক্তদান : ২ নভেম্বর ২০১৪, রবিবার— সারা দেশে বজরঙ্গ দলের উদ্যোগে রক্তদান শিবিরের মাধ্যমে এক লক্ষ মানুষ রক্তদান করেছেন এবং তা বিভিন্ন সরকারি ব্লাড ব্যাঙ্কে জমা করা হয়েছে।

নেত্রদান : ভারতবর্ষকে অন্ধত্ব মুক্ত করার জন্য এক লক্ষ মরণোত্তর চক্ষুদানের সংকল্প করার পরিকল্পনা হয়েছে।

ওয়ার্ল্ড হিন্দু কংগ্রেস : ২১, ২২, ২৩ নভেম্বর দিল্লীর রামলীলা ময়দানে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের বিশ্ব বিভাগের পক্ষ থেকে ৫৪টি দেশের হাজার হাজার প্রতিনিধির বিশাল সম্মেলন ওয়ার্ল্ড হিন্দু কনফারেন্স হয়।

জেলা হিন্দু সম্মেলন : প্রত্যেক জেলায় হিন্দু সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে।

শ্রীরামনবমী, শ্রীরাম জন্মোৎসব : বর্ষ প্রতিপদ (২১ মার্চ ২০১৫) থেকে শ্রীহনুমান জয়ন্তী (৪ এপ্রিল, ২০১৫) পর্যন্ত পরিষদের প্রত্যেক শাখায় শ্রীরাম মহোৎসব পালন করা হবে। সারা দেশে এক লক্ষ কার্যক্রমের লক্ষ্য রাখা হয়েছে।

পরিবেশ সংরক্ষণ : ১৭ জুন থেকে ১৬ জুলাই (২০১৫), একমাস ব্যাপী বৃক্ষরোপণ করা হবে। ঘরে ঘরে তুলসী চারা রোপণ, প্রত্যেক প্রখণ্ডে কমপক্ষে ১০০টি গাছ লাগানো হবে। তার মধ্যে অন্ততঃপক্ষে একটি বটগাছ অবশ্যই থাকবে। একবছর পর্যন্ত রোপণ করা চারার পরিচর্যা করা হবে। প্রত্যেক সৎসঙ্গ স্থানে সুবর্ণ-জয়ন্তীর সমাপ্তি অনুষ্ঠান ১ থেকে ৬ সেপ্টেম্বর (২০১৫) হবে।

নাসিক পূর্ণকুম্ভ : ৬ সেপ্টেম্বর ২০১৫, শ্রীকৃষ্ণ জন্মাষ্টমীকে উপলক্ষ্য করে বিশাল সন্ত-সম্মেলন এবং কেন্দ্রীয় সমাপ্তি অনুষ্ঠান হবে। ■

হিন্দু সম্মেলনে সংকল্প

পশ্চিমবঙ্গকে আর ভাগ হতে দেব না

ডাঃ শচীন্দ্রনাথ সিংহ

ভারত ও ভারতের বাইরে যেখানে যেখানে হিন্দুরা রয়েছেন তাঁদের সামাজিক, ধর্মীয় এবং সাংস্কৃতিক সংগঠন হিসাবে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের পরিচিতি। এই সংগঠনের মাধ্যমে কোটি কোটি হিন্দুকে সংগঠিত করার মহান দায়িত্বে এগিয়ে আসেন স্বামী চিন্ময়ানন্দ, ড. কানহাইয়ালাল মুন্সী, মাস্টার তারা সিং, মাধবরাও গোলওয়ালকর, স্বামী সত্যমিত্রানন্দ গিরি প্রমুখ। পরিষদ তার যাত্রাপথে প্রয়াগকুম্ভে তিনবার বিশ্ব হিন্দু সম্মেলন, সংস্কৃতি রক্ষা নিধি-যোজনা, একাত্মতাযাত্রা, রামশীলা পূজন, শ্রীরামজন্মভূমি মুক্তিযজ্ঞ আন্দোলন, রামসেতু আন্দোলন, অমরনাথ শ্রাইনবোর্ড আন্দোলন সফলভাবে পরিচালনা করেছে।

হাজার বছর পরাধীনতার নাগপাশ থেকে মুক্ত হওয়ার ১৭ বছর পর ১৯৬৪ খৃস্টাব্দে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের প্রতিষ্ঠা হয়। পরাধীনতার কালখণ্ডে হিন্দু সমাজ কারও কাছে মাথা নত করেনি। স্বাধীনতা, আধ্যাত্মিকতা, ভারতের পরম্পরা ও শ্রদ্ধাকেন্দ্রগুলি রক্ষা করার জন্য সতত সংঘর্ষ করেছে। স্বাধীনতার পর দেখা গেল মানুষের ন্যূনতম বাঁচার অধিকারেরও অপব্যবহার হচ্ছে। ধর্মের ভিত্তিতে দেশ বিভাজন এবং তারপর হিন্দু ধর্মের উপর যে আঘাতগুলি আসছে তার উপযুক্ত জবাব কীভাবে দেওয়া যেতে পারে এবং অধর্ম থেকে সমাজকে কীভাবে বাঁচানো যায় তার জন্যই বিশ্ব হিন্দু পরিষদের জন্ম। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গীতার মাধ্যমে আশ্বাস দিয়েছিলেন যে যখনই ধর্মের বিপর্যয় হবে তখনই ধর্মসংস্থাপনের জন্য তিনি আবির্ভূত হবেন। যখন হিন্দুধর্ম ভারতে লাঞ্ছিত, হিন্দুরা নিজভূমে অবহেলিত উপেক্ষিত, প্রতিবেশী দেশগুলি থেকে বিতাড়িত, তখন শ্রীকৃষ্ণ জন্মাষ্টমী তিথিতে মুম্বইয়ের পাওয়াই নামক স্থানে সন্দীপনী আশ্রমে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের প্রতিষ্ঠা। ১৯৬৪ সালের ২৯ আগস্ট। সেই সূত্রেই এবছর বিশ্ব হিন্দু পরিষদের সুবর্ণ জয়ন্তী।



খাগড়াগড়। ফাইল চিত্র

সুবর্ণ জয়ন্তী উপলক্ষে দেশজুড়ে স্বাগত সমিতি গঠিত হয়েছে। ইতিমধ্যেই এই উপলক্ষে অনেক অনুষ্ঠান হয়েছে। আগামী ৬ সেপ্টেম্বর ২০১৫-তে নাসিকে কুম্ভমেলায় সন্ত সম্মেলনের মাধ্যমে এই সুবর্ণ জয়ন্তী মহোৎসবের সমাপ্তি ঘোষণা করা হবে। এখন যে কার্যক্রম চলছে তা হলো জেলায় জেলায় হিন্দু সম্মেলন। বিশ্ব হিন্দু পরিষদ পশ্চিমবঙ্গে বিভিন্ন জেলায় হিন্দু সম্মেলনের আয়োজন করেছে। সেই সঙ্গে ২০ ডিসেম্বর কলকাতা শহীদ মিনার ময়দানে বিরাট হিন্দু সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। বিশ্ব হিন্দু পরিষদ কোনো রাজনৈতিক সংগঠন নয়। নির্বাচনে দাঁড়ানো তার লক্ষ্য নয়— তাহলে হিন্দু সম্মেলন আয়োজনের প্রাসঙ্গিকতা কেন?

ইতিহাস বলে যখনই কোনো দেশের সংখ্যাগুরু সমাজ তার অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়, ক্রমাগত সংখ্যাগরিষ্ঠতা হারাতে থাকে তখনই সেই দেশ খণ্ডিত হয়। দেশবিভাজনের দংশনে বাংলার মানুষ ভুগছে। আজ আবার আমরা কোন দিকে এগোচ্ছি? ছদ্ম-ধর্মনিরপেক্ষতার নাম করে বছরের পর বছর মুসলমান তোষণের যে ন্যক্কারজনক রাজনীতি চলেছে তার বিষময় পরিণতি কি হতে পারে আজ আর বলার প্রয়োজন রাখে না। বর্ধমানের জঙ্গিডেরা আবিষ্কারের পর সকলের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে দেশের নিরাপত্তা ও অখণ্ডতা কী বিপজ্জনক পরিস্থিতির মুখে এসে দাঁড়িয়েছে। ইসলামিক জঙ্গিদের শেকড় কতদূর গজিয়েছে। বর্ধমানের বিস্ফোরণে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী দল এন আই এ আবিষ্কার

করেছে এ রাজ্যের মাদ্রাসাগুলি ইসলামিক মৌলবাদীদের অস্ত্র প্রশিক্ষণকেন্দ্র। গত দু'বছরে কেবলমাত্র নদীয়া ও উত্তর ২৪ পরগনায় ২৭টি অনুমোদনহীন মাদ্রাসা তৈরি হয়েছে যেখানে মহিলা জঙ্গিরা তালিম নিয়েছে। ধর্মশিক্ষার আড়ালে মহিলাদের জঙ্গি তালিম দেওয়া হোত বলে গোয়েন্দারা জানতে পেরেছে। এই ইসলামিক মৌলবাদীদের প্রকৃত উদ্দেশ্য কি?

এক সময় পশ্চিমবঙ্গকে পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত করার বাসনা ছিল মহম্মদ আলি জিন্নার। বাঙালি হিন্দুদের রক্ষা করতে ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় জিন্নার গ্রাস থেকে ছিনিয়ে এনেছিলেন পশ্চিমবঙ্গকে। ১৯৪৭ সালে বাঙালি হিন্দুদের স্বভূমি পশ্চিমবঙ্গকে দখল করতে না পারলেও সেই লক্ষ্যে ছক কষে এগিয়েছে ইসলামিক গোষ্ঠীগুলি। বর্ধমান, বীরভূম, নদীয়া, মুর্শিদাবাদ জুড়ে গজিয়ে ওঠা এই জেহাদিসন্ত্রাসের জাল কত গভীরে বিস্তৃত হয়েছে তা সকলের কাছে দিনের আলোর মতো স্পষ্ট হয়েছে।

অপরদিকে পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক দলগুলি মুসলমান ভোটের লোভে এই চক্রান্তগুলিকে সব সময় আড়াল করার প্রয়াস চালিয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের কয়েকটি সীমান্তবর্তী জেলা মুসলমান বহুল হতে চলেছে। হিন্দুদের উপর ইসলামিক মৌলবাদীদের সংগঠিত ছোট বড় হামলা বাংলার প্রায় সর্বত্র ঘটছে। এর সামান্য কিছু প্রকাশ্যে আসছে। প্রতিটি ঘটনাতেই পুলিশ প্রশাসন নীরব থাকছে। আতঙ্ক ও নিরাপত্তাহীনতায় হিন্দু সমাজ ভুগছে। গ্রাম ছেড়ে হিন্দুরা শহরমুখী হচ্ছে। মুসলমানরা সেই সব জমি বাড়ি দখল নিচ্ছে পরিকল্পিতভাবে। রাজনৈতিক দলগুলি সব দেখেশুনে না দেখার ভান করছে। পরোক্ষে মুসলমানদের হাতই সকলে শক্ত করছে। একবার দেশ ভাগ হয়েছে। আমাদের পূর্বপুরুষরা পৈতৃক ভিটেমাটি ছেড়ে একবার শরণার্থী হয়েছে। আবার সেই পশ্চিমবঙ্গ যদি মৌলবাদী চক্রান্তের শিকার হয় তাহলে আমাদের আর কে বাঁচাবে? পশ্চিমবঙ্গকে রক্ষার জন্য আজ সকলকে এগিয়ে আসতে হবে। এর সঙ্গে জাতীয় নিরাপত্তার প্রশ্নও জড়িয়ে রয়েছে। একথা দৃঢ়তার সঙ্গে সকলকে বলা ও বোঝানোর সময় এসেছে। আসুন, আগামী দিনে আমরা সকলে মত, পথ, পন্থ সম্প্রদায় সমস্ত রাজনৈতিক মতাদর্শের ঊর্ধ্বে উঠে দেশের নিরাপত্তার স্বার্থে দেশের অখণ্ডতা রক্ষার জন্য শপথ গ্রহণ করি— পশ্চিমবঙ্গকে আর ভাগ হতে দেব না। ■

(লেখক ক্ষেত্র সংগঠন সম্পাদক, বিশ্ব হিন্দু পরিষদ)

বিশ্ব হিন্দু পরিষদের সুবর্ণ জয়ন্তী বর্ষে
প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানাই—

Geeta SAREES

Golden Collection

M/s. Sharda Textiles

ভারতে ধর্মান্তরকরণ ও বিশ্ব হিন্দু পরিষদের ভূমিকা



শ্রীমদ দেবানন্দ ব্রহ্মাচারী

> পরাবর্তনের কাজ পরিষদ ছাড়াও স্বামী দয়ানন্দের প্রতিষ্ঠিত আর্যসমাজ এবং ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘও বিশেষভাবে করে চলেছে। এযাবৎ জলপাইগুড়ি, মালদা, মেদিনীপুর ও মুর্শিদাবাদ অঞ্চলের প্রায় দশ হাজার মানুষকে স্বধর্মে ফিরিয়ে আনা হয়েছে পরাবর্তনের মাধ্যমে।

গীতায় শ্রীকৃষ্ণ ভগবান বলেছেন, 'স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্মো ভয়াবহঃ' (৩/৩৫)— নিজের ধর্ম পালন করতে করতে যদি মৃত্যু হয় তাও ভালো কিন্তু অপরের ধর্ম গ্রহণ করা উচিত নয়। তার কারণ হলো, স্বধর্ম পালনের মাধ্যমে যাঁরা শিশুকাল থেকে জীবনযাত্রা নির্বাহ করেছেন তাঁরা অন্য ধর্ম গ্রহণ করলে নতুন করে আবার তাঁদের তৈরি করতে হয় জীবনধারাকে। তার ফলে জীবনে আসে বিভ্রান্তি, বিপর্যয়। তাই ভগবান 'ভয়াবহ' শব্দ ব্যবহার করেছেন। স্বধর্ম পালনের মধ্যে দিয়েই মানুষের জীবনে জাগতিক বা আধ্যাত্মিক কল্যাণ নেমে আসে। সমগ্র বিশ্বে যতপ্রকার ধর্ম আছে তার মধ্যে প্রাচীনতম ধর্ম হলো হিন্দুধর্ম। তাই এই ধর্মের নাম সনাতন ধর্ম। হিন্দুধর্ম বিশ্বের প্রাচীনতম ধর্মগ্রন্থ বেদের শিক্ষা বা উপদেশ অর্থাৎ বেদের কর্মকাণ্ড, ভক্তিকাণ্ড বা জ্ঞানকাণ্ডকে অবলম্বন করেই পালিত হয়ে থাকে। বেদ অপৌরুষেয়। স্বয়ং ভগবান নারায়ণ থেকেই অনাদি অনন্ত অলৌকিক বেদরূপ জ্ঞানরাশির উৎপত্তি হয়েছে। কোনো মানুষ এই বেদ সৃষ্টি করেননি 'ঋষিয়ো মন্ত্রদ্রষ্টারো ন তু বেদস্য কর্তারঃ'— ঋষিরা মন্ত্রদ্রষ্টা কিন্তু বেদের রচয়িতা নন। বেদের মতো হিন্দুধর্মও অপৌরুষেয়। হিন্দুধর্মের স্রষ্টা বা রচয়িতাও কোনো ব্যক্তিবিশেষ নয়। সৃষ্টির প্রারম্ভে স্বয়ং ভগবানই যেমন জ্ঞানরাশিরূপ বেদ সৃষ্টি করেছেন, তেমনি সৃষ্টি করেছেন আদর্শ মানবজীবন গঠনের জন্য সনাতন হিন্দুধর্ম। তাই ভগবান বলেছেন, আমিই এই জগতের পিতা ও মাতা অর্থাৎ সৃষ্টিকর্তা এবং আমিই ওঙ্কার ও ঋগ্বেদ, সামবেদ, যজুর্বেদস্বরূপ 'বেদ্যং পবিত্রমোঙ্কার ঋক্ সাম যজুরেব চ' (গীতা ৯/১৭)।

হিন্দুজাতি বৈদিক তথা রামায়ণ মহাভারতের যুগ থেকেই এই দেবভূমি ভারতবর্ষে বসবাস করছে। তখন ভারতের বাইরে অন্য কোনো দেশ বা ধর্মের বিশেষ উৎপত্তিই হয়নি। তাই সে সময় ধর্মান্তরকরণের কোনো প্রশ্নই ছিল না। ইতিহাস সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, খৃস্টীয় ১০ম শতাব্দীতে তুর্কী সম্রাট অলক্তগিন ভারতের অন্তর্ভুক্ত গান্ধার প্রদেশের গজনির হিন্দু জনসাধারণকে বলপূর্বক মুসলমান করে। এভাবেই ভারতে শুরু হয় মুসলমান

থাকে যদি
ডাটা,
জমে যায় রান্নাটা

ডাটা®
গুঁড়ো মশলা ও পাঁপড়



কেনার সময় অবশ্যই
কৃষ্ণ চন্দ্র দত্ত (কুক্‌মী)
প্রাইভেট লিমিটেড
নাম দেখে তবেই কিনবেন



Krishna Chandra Dutta
(Cookme) Pvt. Ltd.

207 Maharshi Debendra Road,
Kolkata 700007
email : dutaspice@gmail.com

অনুপ্রবেশ ও ধর্মান্তরকরণ। এরপর ভারতে মুসলমানদের বারবার আক্রমণ হলেও তারা ভারতে স্থায়ীভাবে বসবাস করছে আজমীর ও দিল্লীর অধিপতি পৃথ্বীরাজ চৌহান মহম্মদ ঘোরির কাছে দ্বিতীয়বারের যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত হওয়ার পর ১১৯২ খৃস্টাব্দ থেকে। বিশেষভাবে তখন থেকে চলছে বলপূর্বক বা লাভ জেহাদের মতো কিছু পরিকল্পনার মাধ্যমে ধর্মান্তরকরণ। ভারতে খৃস্টান ধর্মাবলম্বী ইংরেজদের রাজত্ব করার কাহিনি আমাদের জানা আছে। ২৩ জুন ১৭৫৭ খৃস্টাব্দে পলাশির যুদ্ধে রবার্ট ক্লাইভ মির্জাফরের সহায়তায় তখনকার বাংলার নবাব সিরাজউদ্‌দৌলাকে বন্দী ও নিহত করে ভারতে বৃটিশরাজ কায়েম করেন। ইংরেজ পলাশি যুদ্ধের বহু পূর্ব থেকে দক্ষিণ ভারতের মাদ্রাজে এবং কলকাতায় তাদের তৈরি দুর্গ ফোর্ট ইউলিয়মকে অবলম্বন করে ভারতে ব্যবসা বাণিজ্য আরম্ভ করে দিয়েছিল, যার নাম ছিল 'ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি'। বৃটিশরাজ শুরু হওয়ার পর তারা প্রথমে মাদ্রাজ ও কলকাতাকে কেন্দ্র করে হিন্দুদের কখনও প্রলভন দেখিয়ে, আবার কখনও বা সেবার আড়ালে ধর্মান্তরকরণের কাজ চালাতে থাকে।

বিশ্ব হিন্দু পরিষদ স্থাপনের পর সাধুসমাজে একটি প্রশ্ন উঠেছিল যে, ধর্মান্তরিত হিন্দুদের পুনরায় স্বধর্মে ফিরিয়ে আনা শাস্ত্রসম্মত কি না? পরিষদের প্রধান সংস্থাপক ক্রান্তদর্শী শ্রীগুরুজী (শ্রীমাধবরাও সদাশিবরাও গোলওয়ালকর— রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের দ্বিতীয় সরসঙ্ঘচালক) পরাবর্তন (স্বধর্মে ফিরিয়ে আনা) সম্বন্ধে এমন প্রশ্ন হতে পারে একথা জানতেন। ১৯৬৬ খৃস্টাব্দে প্রয়াগে পরিষদের পরিচালনায় প্রথম বিশ্ব হিন্দু সম্মেলনে শ্রীগুরুজী উপস্থিত গোবর্ধন পীঠাধীশ জগদ্‌গুরু শঙ্করাচার্য স্বামী নিরঞ্জন তীর্থদেবের সঙ্গে উক্ত বিষয়ে আলোচনা করেন। তারপর সম্মেলনের একটি অধিবেশনে পূজ্য শংকরাচার্য পরাবর্তনকে সমর্থন করে ঐতিহাসিক ঘোষণা করেন সকল ধর্মাচার্যগণের সম্মুখে— 'ন হিন্দুর্পতিতো ভবেৎ'— হিন্দু কোনো কারণেই পতিত হয় না। শঙ্করাচার্যের এই ঘোষণাকে অবলম্বন করে ধর্মান্তরিত হিন্দুদের আবার স্বধর্মে ফিরিয়ে আনার জন্য পরিষদের 'ধর্মপ্রসার বিভাগ' গঠিত হয়েছে। ধর্ম প্রসার বিভাগের প্রধান কাজ হলো— ধর্মান্তরিত হিন্দুদের কিছু মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে স্বধর্মে ফিরিয়ে আনা এবং পাঠ প্রবচন সৎসঙ্গ ও কীর্তন ভজনাদির মাধ্যমে স্বধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা নির্মাণ করা। ধর্ম প্রসার বিভাগের এই কাজ ভারতের শহর থেকে গ্রাম ও পার্বত্য অঞ্চলের সর্বত্র প্রসারিত রয়েছে। এই পরাবর্তনের কাজ পরিষদ ছাড়াও স্বামী দয়ানন্দের প্রতিষ্ঠিত আর্যসমাজ এবং ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘও বিশেষভাবে করে চলেছে। যাঁরা স্বধর্মে ফিরে আসছেন তাঁদের উপযুক্ত শিক্ষা, রোজগার এবং সুরক্ষার ব্যবস্থাও করা হয়ে থাকে।

পরাবর্তন বিষয়ে উদাহরণ হিসেবে বলা যেতে পারে— রাজস্থানের আজমীর, পালী এবং ভীলওয়াড়া জনপদের প্রায় তিন লক্ষ মেহরাত সম্প্রদায় মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করেছিল ভয়ে জীবন রক্ষার জন্য। তারা বিবাহাদি অনুষ্ঠানে মুসলমান ও হিন্দুরীতি উভয়ই মেনে চলে। বিবাহে কলমা পরে আবার পণ্ডিতদের দ্বারা সপ্তপদী চলার অনুষ্ঠানও করে। তাদের পূর্বপুরুষ পৃথ্বীরাজ চৌহান এবং ইষ্টদেবী আশাপূর্ণা মা। পরিষদের রাজস্থান প্রান্তের কার্যকর্তারা ওই জাতির গ্রামে গ্রামে ভ্রমণ করে প্রথম সংবাদ সংগ্রহ করেন, তারপর তাঁদের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সঙ্গে দীর্ঘ আলোচনা করেন। পরে কার্যকর্তারা গ্রামবাসীদের মধ্যে স্বধর্মের প্রতি স্বাভিমান বোধ জাগানোর জন্যে প্রথমে তাদের নিয়ে সম্রাট পৃথ্বীরাজ চৌহানের জন্মজয়ন্তী পালন করতে শুরু করেন এবং আশাপূর্ণা মাতার রথযাত্রা উৎসব করেন। ধীরে ধীরে নানা ধরনের কার্যক্রম বাড়তে থাকে। এর ফলে সেখানকার জনগণ তাঁদের হিন্দু পরম্পরা সম্বন্ধে সচেতন হয় এবং পরিষদ দ্বারা আয়োজিত পূজা এবং যজ্ঞাদির মাধ্যমে ৮০ হাজার মেহরাত সম্প্রদায় হিন্দুধর্মে ফিরে আসে। এখন ওই অঞ্চলে ৬০টি মন্দির নির্মাণ হয়েছে, নিয়মিত কীর্তন ভজনের জন্য ভজনমণ্ডলী তৈরি হয়েছে। সেখানে আশাপূর্ণা মাতার মন্দির, বিদ্যালয় এবং ছাত্রাবাস নির্মাণ করেছে বিশ্ব হিন্দু পরিষদ।

দক্ষিণ ভারতের রামনাথপুরম্ জেলায় ব্যাপক ধর্মান্তরকরণ হয়। সেখানে পরিষদের কার্যকর্তাদের দ্বারা জনসম্পর্ক, সাধুসন্তদের পদযাত্রা ও প্রবচন এবং সন্তরা হরিজনদের সঙ্গে একসঙ্গে বসে ভোজন করেন। মালয়েশিয়ার সন্ত শ্রীরামদাস এক মাস ধরে ওই গ্রামগুলিতে পদযাত্রা করেন। তার ফলে ওখানকার ধর্মান্তরিত হরিজন সমাজ স্বধর্মে ফিরে আসে এবং পুনরায় পরধর্ম গ্রহণ না করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। ১৯৮১ খৃস্টাব্দে তামিলনাড়ুর মীনাক্ষীপুরম্ অঞ্চলে হরিজনদের ব্যাপকহারে মুসলমানরা ধর্মান্তরিত করে। ১৯৮২ খৃস্টাব্দে পরাবর্তন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত ১১৪ জন কার্যকর্তা সেখানে পৌঁছন। তাঁরা জনসম্পর্ক, ধর্মসভা, বৈঠক এবং সন্তদের উপস্থিতির মাধ্যমে তাদের অনেককেই স্বধর্মে ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হন। তামিলনাড়ুর ইন্দতকুরাই গ্রামের জেলেরা ৪০০ বছর পূর্বে খৃস্টানধর্ম গ্রহণ করেছিল। কিন্তু বর্তমানে সেখানের চার্চের লোকেরা তাদের ওপর নানাভাবে অত্যাচার করতে থাকে। পরিষদের কার্যকর্তা ও সন্তদের প্রচেষ্টায় ১৭৬টি পরিবারের ১২০০ জন সদস্য বিধিবৎ স্বধর্মে ফিরে এসেছে।

পশ্চিমবাংলাতেও পরাবর্তনের কাজ যথাসম্ভব ভালোভাবেই চলছে। এযাবৎ জলপাইগুড়ি, মালদা, মেদিনীপুর ও মুর্শিদাবাদ অঞ্চলের প্রায় দশ হাজার মানুষকে স্বধর্মে ফিরিয়ে আনা হয়েছে পরাবর্তনের মাধ্যমে।

ধর্মান্তরকরণ প্রকৃতপক্ষে একটি ভয়াবহ রাষ্ট্রীয় সমস্যা। ধর্মান্তর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঘটে যায় রাষ্ট্রান্তরও। তখন ভারতবর্ষের নাগরিক হলেও তাঁদের রাষ্ট্রভক্তি থাকে পাকিস্তান বা রোমকে কেন্দ্র করে। তাই ধর্মান্তরকরণ দেশের সুরক্ষার পক্ষেও ক্ষতিকারক। মোরারজী দেশাই প্রধানমন্ত্রী থাকাকালে এ বিষয়ে একটি বিল আনা হয়েছিল পার্লামেন্টে— 'জোর করে বা প্রলোভন দেখিয়ে কোনো ব্যক্তিকে ধর্মান্তরিত করা যাবে না'। ওই বিলের প্রতিবাদে মাদার টেরিজা দিল্লীতে মিছিল করেছিলেন। সরকার তখন চাপে পড়ে ওই বিল প্রত্যাহার করে নিয়েছিলেন। দেশের বর্তমান পরিস্থিতিতে মনে হয় আইন করে ধর্মান্তর বন্ধ করা উচিত। প্রয়োজন বিশ্ব হিন্দু পরিষদের এই রাষ্ট্রহিতজনক কাজকে ঐকান্তিকভাবে সহযোগিতা করা। ■

হিন্দু জাগরণের অগ্রদূত

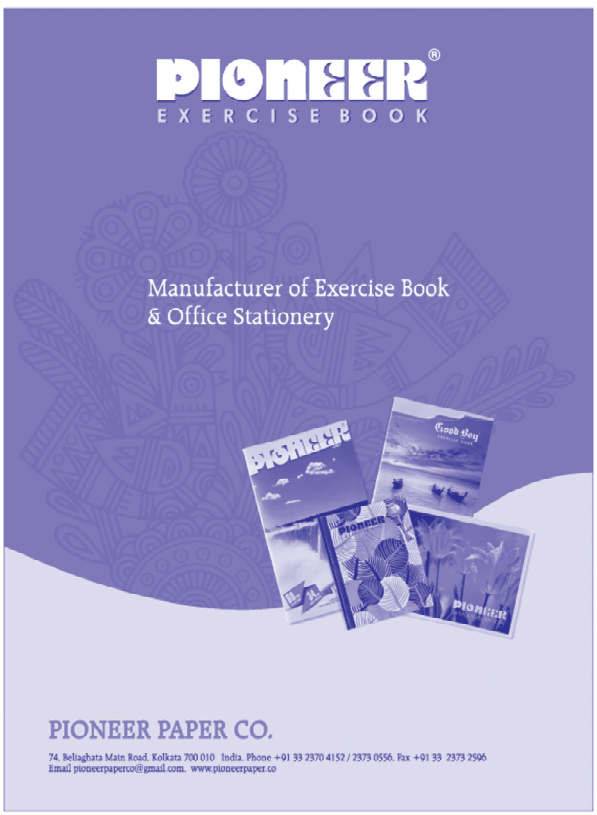
কর্মবীর দাদাসাহেব আপ্তে



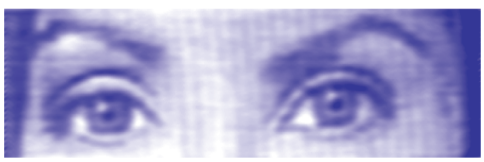
(জন্ম : ২ ফেব্রুয়ারি, ১৯০৫ ▯ মৃত্যু ১০ অক্টোবর, ১৯৮৫)

বিশ্ব হিন্দু পরিষদ ও হিন্দুস্থান সমাচার— এই দুই সংগঠনেরই প্রেরণার উৎস সঙ্ঘ এবং এই প্রেরণার মাধ্যম দাদাসাহেব আপ্তে শিবরাম শঙ্কর আপ্তে। তাঁর জন্ম ২ ফেব্রুয়ারি, ১৯০৫। পুনানিবাসী দাদাসাহেব ওকালতি করতেন। ১৯৩৯ খৃস্টাব্দে দাদাসাহেব সঙ্ঘের সংস্পর্শে এসেছিলেন। ১৯৪০ সালে নাগপুরে সঙ্ঘশিক্ষা বর্গে শ্রীগুরুজী সর্বাধিকারী ছিলেন। সেই প্রশিক্ষণ শিবিরে চল্লিশদিন শ্রীগুরুজীর সান্নিধ্য লাভ করে দাদাসাহেব সঙ্ঘের প্রচারক হিসেবে আত্মোৎসর্গ করেন। সঙ্ঘের প্রচারক হিসেবে তিনি প্রথমে তামিলনাড়ু গিয়েছিলেন।

সঙ্ঘের উপর গান্ধী হত্যার মিথ্যা অভিযোগে সরকারি নিষেধাজ্ঞা জারি এবং সংবাদমাধ্যমের এই বিষয়ে নেতিবাচক ভূমিকা দেখে তিনি সংবাদসংস্থা স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। তাঁর এই ভাবনা-চিন্তার ফসল বহুভাষী 'হিন্দুস্থান সমাচার'। তিনি এর প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক ছিলেন। কিছু সংগঠনের আবশ্যিকতা নিয়ে তিনি বেশ কয়েকটি গ্রন্থ রচনা করেন যা শ্রীগুরুজীকেও প্রভাবিত করেছিল। বিশ্বের হিন্দুদের সংগঠিত করার লক্ষ্যে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের প্রতিষ্ঠার জন্য দেশ-বিদেশের হিন্দু বিদ্বজ্জন, প্রণম্য সাধুসন্ত ও বিভিন্ন সংগঠনের প্রমুখের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ ও আলোচনা করেন। এর পরিণাম স্বরূপ ১৯৬৪ সালে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের প্রতিষ্ঠা ও ১৯৬৬ সালে প্রয়াগের কুম্ভমেলায় পরিষদের উদ্যোগে হিন্দু সম্মেলন হয়। বলা হয়ে থাকে, সম্রাট হর্ষবর্ধনের পর এই প্রথম হিন্দুধর্মের সকল মতপথ, জাত-পাত নির্বিশেষে সাধুসন্তরা এক মঞ্চে সমাসীন হয়েছিলেন। প্রকৃত অর্থেই তিনি কর্মবীর। দাদাসাহেব শব্দের সাধক নয়, কর্মের সাধক ছিলেন। তিনি শিব ও রামের একই সঙ্গে সাধন করতেন। দাদাসাহেবের প্রদর্শিত পথে বিশ্ব হিন্দু পরিষদ আজও এগিয়ে চলেছে।



নেত্রদান মহাদান



EYE BANK

23580201, 23341628, 23592931
Mobile - 9830333451

অনুসন্ধান ঃ 22181995, 22180387

সৌজন্যে ঃ কলাভারতী

হিন্দু জাগরণের অগ্রদূত

নিরলস যোদ্ধা অশোক সিংঘল

বিশ শতকের নয়ের দশকে শ্রীরামজন্মভূমি আন্দোলনের সময় যাঁর বজ্র নির্ঘোষ রাষ্ট্রভক্তদের হৃদয় আন্দোলিত করেছিল, অন্যদিকে কম্পিত করেছিল রাষ্ট্রদ্রোহীদের হৃদয়— তিনি সন্ত-যোদ্ধা, সঙ্ঘের প্রচারক অশোক সিংহল। দেশ ও ধর্মের কাজে আত্মনিবেদনই তাঁর কাছে রাষ্ট্রধর্ম। সাহস, সমর্পণ ও শৌর্যের প্রবাদপুরুষ শ্রী অশোক সিংহলের জন্ম ১৯২৬ খৃস্টাব্দের ১৫ সেপ্টেম্বর। তিনি নিজেই বলেছেন, তাঁর মা ও বাবা অত্যন্ত ধার্মিক ছিলেন। যখন নবম শ্রেণীর ছাত্র, সেসময় দয়ানন্দ সরস্বতীর জীবনী পড়ে তাঁর মনে হয়েছিল, ভারতবর্ষের সাধু-সন্তদের আধ্যাত্মিক শক্তির রহস্যময় সামর্থ্যের এক সমৃদ্ধ পরম্পরা রয়েছে। পরবর্তীকালে প্রয়াগে সন্ত-মহাত্মাদের সংস্পর্শে এসে সেই আধ্যাত্মিক শক্তি তিনি অনুভবও করেছেন। বস্তুত পারিবারিক সংস্কার ও সাধু-সন্তদের প্রভাবেই তাঁর জীবন গড়ে উঠেছে। সেই তরুণ বয়সেই তিনি স্থির করেছিলেন গৃহস্থের জীবনযাপন করবেন না।

১৯৪২ সালে প্রয়াগে যখন তিনি কলেজ জীবনে প্রবেশ করেছেন, সেই সময় থেকে সঙ্ঘের শাখায় যাওয়া শুরু করেন। ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাজন তাঁর কাছে বজ্রাঘাত তুল্য মনে হয়েছিল। সঙ্ঘের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি হয়েছিল। তাঁর মনে হয়েছিল নির্বাচিত প্রতিনিধিরা সংসদে যদি সত্য কথাই না বলতে পারেন তাহলে তাঁরা দেশকে কীভাবে পরিচালনা করবেন। বরং এঁরা দেশকে অসত্যর দিকে ঠেলে নিয়ে যাবেন। তখনই তিনি সঙ্ঘের প্রচারক হওয়ার সংকল্প গ্রহণ করেন।

তাঁকে সঙ্ঘে নিয়ে আসার পেছনে রজ্জু ভাইয়ার (সঙ্ঘের চতুর্থ সরসঙ্ঘচালক) অবদান ছিল। রজ্জু ভাইয়া তাঁদের বাড়িতে আসতেন। মাকে সঙ্ঘের কথা, সঙ্ঘের প্রার্থনার কথা বলতেন। কিন্তু কেউ যদি মনে করে মায়ের কথা শুনেই তিনি শাখায় এসেছেন, তা ঠিক নয়। বরং, জেনে-বুঝেই তিনি সঙ্ঘের শাখায় যাওয়া শুরু করেন। তাঁর মনে হয়েছিল, হিন্দুস্থানে এই সংগঠনের প্রয়োজন আছে।



সঙ্ঘ থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের প্রতিবাদে তিনি সত্যাগ্রহ করে জেলে গিয়েছিলেন। জেল থেকে মুক্তির পর তিনি ও তাঁর স্বয়ংসেবক বন্ধু মাধবরাও দেশমুখ স্থির করেছিলেন— পড়াশোনা শেষ করার পর তাঁরা সঙ্ঘের প্রচারক হবেন। ১৯৫০ খৃস্টাব্দে কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ধাতুবিদ্যায় কৃতিত্বের সঙ্গে ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রি লাভের পর সংকল্প মতো তিনি সঙ্ঘের প্রচারক হিসেবে স্বদেশ ও সমাজের সেবায় আত্মোৎসর্গ করেন।

তাঁদের পরিবারে সাধু-সন্তদের যাতায়াত ছিল। বৃন্দাবনের সন্ত শরণানন্দ মহারাজ, ঋষিকেশের স্বামী পুরুষোত্তমানন্দজী প্রমুখ সাধুসন্তরা তাঁদের বাড়িতে আসতেন। এঁদের দু'জনের প্রভাব তাঁর উপর ছিল। কিন্তু প্রচারক হিসেবে যখন তিনি কানপুরে এলেন তখন শ্রীরামচন্দ্র তেওয়ারী-র সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। গৃহস্থ হলেও তিনি বেদজ্ঞ ও সিদ্ধ সন্ত ছিলেন। শুধু অশোকজী নন, তাঁর পরিবারও তাঁর দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। বেদজ্ঞ তেওয়ারিজীকেই তিনি নিজের গুরু হিসেবে বরণ করেছিলেন। তাঁরই নির্দেশে ও তার মায়ের উদ্যোগে উদয়পুরে আঠারো দিন ধরে ব্রহ্মযজ্ঞ করেছিলেন। অশোকজী এই সময় শ্রীগুরুজীকে (সঙ্ঘের তৎকালীন সরসঙ্ঘচালক) এক চিঠি লিখে জানিয়েছিলেন, সঙ্ঘকাজ করার সময় তেমন শান্তি মেলেনি, কিন্তু আঠারো দিন যজ্ঞের পর এক গভীর প্রশান্তি অনুভব করেছেন। তাঁর বিশ্বাস দেশ ও মনকে শান্ত করবার জন্য এর থেকে বেশি উপযুক্ত উপায় আর কিছু নেই। শ্রীগুরুজী প্রত্যুত্তরে লিখেছিলেন— বেদের স্বরশক্তির প্রভাবেই তোমার এরকম অনুভব হচ্ছে। কিন্তু দেশে কতজন লোক বুঝতে পারবে যে বেদ উচ্চারণের মধ্যেই দেব-জাগরণের প্রচণ্ড শক্তি লুকিয়ে আছে। আমাদের বেদ-বেদাঙ্গ উপনিষদ প্রভৃতি অপার জ্ঞানভাণ্ডার। আজ এই বিদ্যাচর্চার অভাবে আমাদের প্রকৃত পরিচয়টি বিস্মৃত হতে বসেছি। যখন ওই তত্ত্বজ্ঞান নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করতে পারব, তখনই আমাদের স্বরূপ আমরা অনুভব করতে পারব।

সাহারানপুর, কানপুর, দিল্লী, হরিয়ানায় সঙ্ঘের প্রচারক হিসেবে কাজ করার পর তিনি বিশ্ব হিন্দু পরিষদের সর্বভারতীয় সম্পাদক হন। ১৯৯৩ সাল থেকে তিনি পরিষদের আন্তর্জাতিক কার্যকরী সভাপতি। এখন পরিষদের সংরক্ষক।

একাত্মতা যজ্ঞ, অযোধ্যায় করসেবা, গঙ্গা সংরক্ষণ জাগরণ যাত্রা, দেশ-বিদেশে বিরাট হিন্দু সম্মেলনে তিনি সফল নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। শ্রীরামজন্মভূমি মুক্তি আন্দোলনের তিনি অগ্রদূত। অসামান্য তাঁর নেতৃত্ব। শ্রীরামজন্মভূমি আন্দোলনকে তিনি এমন এক পর্যায়ে উন্নীত করেছেন যার ফলে অযোধ্যায় শুধু রামন্দিরের পুনর্নির্মাণ নয়, দেশ তথা সমগ্র বিশ্বে হিন্দুত্বের বিকাশের পথ সুগম হয়েছে। রাষ্ট্র কল্যাণে নিবেদিত ঋষিপ্রবর শ্রী অশোক সিংহলের উদাত্ত আহ্বানের এক দিকে লক্ষ লক্ষ হিন্দু যুবক ও অন্য দিকে ভিন্ন ভিন্ন মত ও পথের সাধুসন্তগণ ঐক্যবদ্ধ। ক্ষাত্রতেজ ও ব্রহ্মতেজের এক অপূর্ব মেলবন্ধন ঘটিয়েছেন তিনি। নিরলস যোদ্ধা, এক নিষ্কাম কর্মযোগী, তেজোদৃপ্ত হিন্দুত্বের কিংবদন্তী পুরুষ। ■

ব্যক্তি যখন আদর্শের মূর্ত স্বরূপ

আচার্য গিরিরাজ কিশোর

কথায় বলে 'জন্ম হোক তথা কর্ম হোক ভাল'। আচার্য গিরিরাজ কিশোর ছিলেন এই আপ্তবাক্যটির জীবন্ত প্রতিমূর্তি। আদর্শের প্রতি নিষ্ঠা ও আত্মনিবেদনে তিনি ছিলেন অনন্য। যখন ভারতের কোনো হিন্দু সংগঠনই হিন্দুদের জন্য কি করতে হবে, কীভাবে করতে হবে তা খুঁজে পাচ্ছিল না, তখন আচার্যজী একাই আমাদের পথ দেখিয়ে গেছেন। তাঁর কাছে সে সময়ে ক্ষমতা, অর্থ বা সামাজিক সচেতনতা ও সমর্থন না থাকতেও হিন্দুস্বার্থ রক্ষার্থে তিনি হিমালয় পর্বতের মতো দাঁড়িয়েছিলেন। এখনকার প্রজন্ম আচার্যজীকে শুধুমাত্র শ্রীরামজন্মভূমি আন্দোলনের একজন বৃদ্ধনেতা বলেই জানে। কিন্তু তাঁর ব্যক্তিত্বের সমস্ত দিকগুলির বিষয়ে কিছুই জানে না।

গিরিরাজজী ১৯২০ সালের ৪ঠা ফেব্রুয়ারি উত্তর প্রদেশের এক সাধারণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। জীবনের প্রথম দিকে মিসৌলি, হাথরস, আলিগড় ও আগ্রায় শিক্ষণগ্রহণ করেন। ছাত্রাবস্থায় তিনি দীনদয়াল উপাধ্যায় ও ভক্তিরাও জুগাড়ের মতো বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সান্নিধ্যে আসেন। তাঁদের সংস্পর্শে এসে গিরিরাজজী রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘে যোগদান করেন। ১৯৪৪ সাল থেকে প্রায় ৭০ বছর তিনি সঙ্ঘের প্রচারকরূপে কাজ করেছেন। ১৯৪৮ সালে সঙ্ঘকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করার প্রতিবাদে আরও অনেকের মতো গিরিরাজজীও কারাবরণ করেন। প্রায় ১৩ মাস ধরে তিনি মৈনপুরী, আগ্রা, বেরিলি ও কাশীর বিভিন্ন জেলে বন্দী থাকেন। ১৩ মাস পরে কারান্তরাল থেকে যে মানুষটি বেরিয়ে এলেন, তিনি আগের থেকে অনেক সমর্থ ও শক্তিশালী। এরপর তিনি ইতিহাস, রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও হিন্দীতে স্নাতকোত্তর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তিনি ছিলেন একজন সাহিত্যরত্ন ও সংস্কৃতজ্ঞ।



এ সময়ে তাঁর জ্যেষ্ঠভ্রাতা পরলোকগত হওয়ায় তাঁর উপরে সংসারের আর্থিক দায়ভার এসে পড়ে। সেজন্য তিনি ভিন্দ অঞ্চলে একটি কলেজের অধ্যক্ষের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। অতি স্বল্প সময়ে কলেজের এত উন্নতি করেন যে দূরদূরান্তের ছাত্রেরা সেখানে পড়তে আসতে শুরু করে। একবার কিছু ডাকাত কলেজের হস্টেলটি আক্রমণ করে ও কিছু ছাত্রকে অপহরণ করে। গিরিরাজজী ডাকাতদের সঙ্গে সংঘর্ষ করে অপহৃত ছাত্রদের ছাড়িয়ে আনেন।

যুবক গিরিরাজজী অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদের সর্বভারতীয় সহ-সভাপতি মনোনীত হন। বিদ্যার্থী পরিষদ দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সংসদে বিজয়লাভ করে। বিদ্যার্থী পরিষদকে গড়ে তোলার জন্য তিনি চাকরি ছেড়ে দেন। এরপরে তিনি রাজস্থানে জনসঙ্ঘের সংগঠন সম্পাদকরূপে কাজ করতে থাকেন। জরুরি অবস্থায় তিনি পুনরায় ১৫ মাস যোধপুর, ভরতপুর ইত্যাদি স্থানে কারারুদ্ধ থাকেন। এরপরে আর পিছনে ফিরে তাকাতে হয়নি। ১৯৭৯ সালে মীনাক্ষীপুরমে বলপূর্বক ৩ হাজার হিন্দুকে ইসলামে ধর্মান্তরিত করার জঘন্য ঘটনা ঘটে। তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী ড. করণ সিংকে বিষয়টি দেখতে বলেন। ড. করণ সিং আচার্যজী ও রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘকে এজন্য কাজে লাগান। মথুরায় 'বিরাট হিন্দু সমাজ' নামে এক বিশাল হিন্দুমঞ্চ গড়ে তুলতে তাঁরা সক্ষম হন। আচার্যজীর সফল্য দেখে এবার সঙ্ঘ তাঁকে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের দায়িত্ব দেয়। আচার্যজীর সুযোগ্য নেতৃত্বে পরিষদের অভূতপূর্ব সাংগঠনিক বৃদ্ধি হয়। ১৯৮৩-র একাত্মতা যাত্রা, ভারতমাতা গঙ্গামাতা অভিযান ইত্যাদি জাতীয় জীবনে এক নব আনন্দের জোয়ার বইয়ে দেয়। অযোধ্যায় শ্রীরামমন্দির আন্দোলনটি সম্পন্ন হয় তাঁর মতো নেতাদের অফুরন্ত উৎসাহ ও শক্তির ফলে। আচার্যজীর বিরুদ্ধে বহু প্রকার মামলা ঠুকে দেওয়া হয়। সমস্ত মামলা তিনি মর্যাদার সঙ্গে সামলান। তাঁকে দেখে চিরকাল উৎসাহ অনুপ্রেরণা পাওয়া যায়। ওনাকে কখনও রাগতে দেখা যায়নি। গভীর রাজনৈতিক প্রজ্ঞা ও হৃদয় গলানো উষ্ণতা থাকার কারণে তিনি তাঁর রাজনৈতিক-সামাজিক বা পরিবেশগত কল্যাণমূলক প্রকল্পগুলির বহু উন্নতি করতে পেরেছিলেন।

দীর্ঘ অসুস্থতার মধ্যে তাঁর দু'চোখে সেই অনমনীয় শক্তি ও অঙ্গীকার ছিল। তিনি বলতেন, "এবার তো রামমন্দির হবে"। তাঁর কণ্ঠস্বরে ছিল অনেক আশা ও চোখে প্রশ্ন। ২০১৪-র ১৩ জুলাই ৯৫ বছর বয়সে তিনি পরলোকগমন করেন। মৃত্যুতেও তিনি ছিলেন অনন্য। উনি নিজের শরীর চিকিৎসা গবেষণার জন্য দান করে দিয়ে গেছেন। আচার্য গিরিরাজ কিশোর ছিলেন জীবন্ত প্রেরণাস্থল। তাঁর মতো যাবতীয় প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে, মিডিয়ার শত বিরূপ প্রচারের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হওয়া মোটেও সহজ ছিল না। যেখানে কাউকেই সাহায্যের জন্য পাওয়া যাচ্ছে না, সেখানেও তিনি নিজের আস্থায় অবিচল থেকেছেন। তাঁর ভেতরকার অফুরন্ত শক্তি হিন্দুসমাজকে ধরে রেখেছে। তাঁর শ্রীরামজন্মভূমি মন্দির ও হিন্দুরাষ্ট্র পুনরুত্থানের স্বপ্ন সার্থক হবেই। আচার্যজী আমাদের মাঝে চিরকাল থাকবেন। স্বর্ণাভ দীর্ঘশ্মশ্রুমণ্ডিত উজ্জ্বল মুখমণ্ডলে শিশুর ন্যায় স্মিতহাস্য ও অনন্ত আশা তিনি চিরকাল আমাদের আশীর্বাদ করে যাবেন।

শ্রীরামজন্মভূমি মুক্তি আন্দোলন
পশ্চিমবঙ্গে শ্রীরামশিলা পূজন

বাসুদেব পাল

বাইরে এপ্রিলের গরম। ভেতরটা শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত হলেও আলোচনার উত্তাপে সরগরম। স্থান দক্ষিণ কলকাতার হিন্দী হাইস্কুলের ভূতল সভাগার। উদ্যোক্তা চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্টদের একটি সংস্থা। বিষয় 'স্বাধীন ভারতে ধর্মনিরপেক্ষতা'। যতদূর মনে পড়ে, বক্তাদের তালিকায় ছিলেন সর্বশ্রী রাম জেঠমালানি, পি এন লেখি, রফিক জ্যাকেরিয়া, সুরেন্দ্রমোহন এবং প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ও আই এ এস ক্যাডার সৈয়দ সাহাবুদ্দিন। সভার পরিচালক বলে দিয়েছিলেন, প্রত্যেক বক্তা নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই বক্তব্য রাখবেন। তারপর শ্রোতাদের লিখিত প্রশ্নের জবাব দেবেন। আয়োজকদের পক্ষ থেকে প্রশ্ন সংগ্রহ ও প্রশ্ন লেখার কাগজ/স্লিপ শ্রোতাদের সরবরাহ করা হবে। অন্যান্য বক্তার মধ্যে ছিলেন প্রাক্তন বিজেপি নেতা, রাজ্যপাল ও বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী এবং সাপ্তাহিক অর্গানাইজার এবং একসময়ে বহুল প্রচারিত দৈনিক মাদারল্যান্ড পত্রিকার সম্পাদক কে আর মালকানি। সব ঠিকঠাকই চলছিল। গোল বাধল সাহাবুদ্দিন সাহেব বক্তব্য রাখার সময়। তিনি তাঁর বক্তব্যে প্রসঙ্গ উত্থাপন করে সরাসরি আক্রমণ করে বসলেন শ্রীরামশিলা পূজনের।



রামজন্মভূমিতে শিলান্যাস।

শ্রোতারা হৈচৈ বাধিয়ে দিল। সাহাবুদ্দিন থামতে বাধ্য হলেন। হাল ধরলেন সভাপতি মহোদয়। তিনি অনুরোধ জানালেন, সাহাবুদ্দিনকে বলতে দিন। পরে প্রশ্ন করুন। সভা কিঞ্চিৎ শান্ত। তবে একেবারে নয়।

কে আর মালকানি একা 'কুম্ভ'। যথারীতি বক্তব্যের পর প্রশ্নোত্তর। সাহাবুদ্দিনকেই বেশি প্রশ্ন করা হয়েছে বলে জানালেন সঞ্চালক বা সংযোজক। তার মধ্যে একটা প্রশ্ন ছিল— ভগবান শ্রীরামচন্দ্র ও ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে তিনি ভারতবর্ষের মহাপুরুষ এবং ভারতবাসীর পূর্বপুরুষ বলে স্বীকার করেন কিনা? অবস্থা, পরিবেশ এমনটাই ছিল যে, সাহাবুদ্দিন স্বীকার করে নিলেন, হ্যাঁ, রাম ও কৃষ্ণকে তিনি মহাপুরুষ বলে স্বীকার করেন।

আসলে সাহাবুদ্দিন এবং তাঁর মতো ভারতের মুসলমানদের মৌরসীপাট্টাতে ধাক্কা লেগেছিল সেদিনই, যেদিন হরিদ্বারে কুম্ভমেলায় 'শ্রীরামজন্মভূমি ন্যাস' ১৯৮৯-এর জানুয়ারি মাসে সাধু-সন্তদের নিয়ে দেশ জুড়ে শ্রীরামশিলা পূজনের কার্যক্রম ঘোষণা করে। এযুগের প্রবাদপ্রতিম সন্ত বর্তমানে ব্রহ্মলীন যোগীরাজ দেবরাহা বাবার আশীর্বাদ নিয়ে শিলা পূজনের শুভ সংকল্প গৃহীত হয়। দেবরাহা বাবা বিশ্ব হিন্দু পরিষদের প্রধান সূত্রধার অশোক সিংহল এবং শ্রীশচন্দ্র দীক্ষিতকে আশীর্বাদ করে বলেছিলেন, 'শ্রীরামমন্দির হবেই।'

স্বাধীনোত্তর ভারতবর্ষের ইতিহাসে শ্রীরামমন্দির আন্দোলন একটি বিশেষ অধ্যায়। এই অধ্যায়কে কোনো রাজনৈতিক দল, নেতা, ব্যক্তি, ঐতিহাসিক এমনকী সামাজিক ও ধর্মীয় সংগঠনের পক্ষে অস্বীকার, অবহেলা বা উপেক্ষা করা সম্ভব নয়। নব্বই দশকের এই চূড়ান্ত আন্দোলনের সূত্রপাত হয়েছিল ১৯৮৪ সালেই। গঠিত হয়েছিল ধর্মস্থান মুক্তি যজ্ঞ সমিতি। সমিতির প্রধান ছিলেন তৎকালীন উত্তরপ্রদেশের প্রাক্তন কংগ্রেসী মন্ত্রী দাউদয়াল খান্না। কার্যকরী সভাপতি ছিলেন সাংসদ মোহন্ত অবৈদ্যনাথ। প্রথমে আন্দোলন শুরু হয়েছিল শ্রীরামমন্দিরের বন্ধ তালা খোলার দাবিতে। সেজন্য কেবলমাত্র বিহার এবং উত্তরপ্রদেশে শ্রীরাম-জানকী রথযাত্রার আয়োজন হয়। ওই রথযাত্রা বিপুল জনসমর্থন লাভ করে। ১৯৮৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ফৈজাবাদ কোর্টের আদেশে তালা খুলে যায়।

এরপরই শ্রীরামমন্দির পুনর্নির্মাণের জন্য 'শ্রীরামজন্মভূমি ন্যাস' গঠিত হয়। শ্রীরামজন্মস্থান এবং আশপাশের জমিতে যে সকল মন্দির ছিল প্রত্যেকেই জন্মভূমি ট্রাস্টকে জমির মালিকানা হস্তান্তর করেন। পরবর্তী আন্দোলন পরিচালিত হয় সাধু-সন্তদের নির্দেশে।

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের প্রবীণ প্রচারক শ্রদ্ধেয় মোরোপন্ত পিংলে (২০০৩-এ

পরলোকগমন করেছেন এবং সেই সময় বিশ্ব হিন্দু পরিষদের কেন্দ্রীয় অছি পরিষদের সদস্য ছিলেন) সারা দেশের বিপুল জনসাধারণকে রামমন্দির পুনর্নির্মাণে সংযুক্ত করার জন্য এক অভূতপূর্ব পরিকল্পনা করেন। সেই পরিকল্পনাই হলো— শ্রীরামশিলা পূজন। ভারতবর্ষের প্রতি দু'হাজার জনবসতিকে একটি একক (ইউনিট) ধরা হয়। এই জনবসতির এক একটি হিন্দু পরিবার কমপক্ষে চারটি ইঁটের দাম দেবেন। প্রতিটি ইঁটের দাম পাঁচসিকে। চারটির দাম পাঁচ টাকা। ওই পাঁচ টাকার কুপন দিয়ে টাকা নেওয়া হবে। প্রতি দু'হাজার জনসবসতিতে একটি শ্রীরামশিলা পূজা হবে। ইঁটের উপর 'শ্রীরাম' লেখা বা খোদাই করা থাকবে। সেখানে উপখণ্ডের সকলে একত্রে আসবেন। শ্রীরামশিলা পূজা করে সংকল্পমন্ত্র পাঠ করবেন। অঞ্জলি দেবেন। পরে ওই পূজিত রামশিলা (ইষ্টকখণ্ড) জেলাকেন্দ্র এবং পরে প্রদেশকেন্দ্রে জমা হবে। নির্দিষ্ট দিনে প্রদেশে বড় জনসভা হবে। প্রদেশের লাগোয়া অন্যান্য জেলা থেকেও ওইরকম পূজিত শ্রীরামশিলা প্রদেশকেন্দ্রে আসবে। সেখান থেকে বজরঙ্গ দলের সদস্যদের পাহারায় ওইসকল পূজিত শিলা সড়কপথে অযোধ্যায় পাঠানো হবে। এইরকম পরিকল্পনা হয়। পশ্চিমবঙ্গে এই অনুষ্ঠান ও কর্মসূচি সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করার উদ্দেশ্যে গঠিত হয়— শ্রীরামশিলাপূজন সমিতি। সমিতির সভাপতি হন মহামণ্ডলেশ্বর স্বামী বিষ্ণুপুরী মহারাজ এবং সম্পাদক হন কিংকর তপানন্দ মহারাজ। তপানন্দজী শ্রীশ্রীঠাকুর সীতারামদাস ওঙ্কারনাথের সাক্ষাৎ শিষ্য। শ্রীরামশিলা পূজন সমিতির মধ্যে ছিলেন ড. ধ্যানেশনারায়ণ চক্রবর্তী, শ্রীমদ্ দেবানন্দ ব্রহ্মচারী মহারাজ এবং অন্যান্য অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তি। সে সময়ে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের স্বয়ংসেবকরা শিলাপূজন সম্পন্ন করার জন্য বিশ্ব হিন্দু পরিষদের নেতৃত্বে এই আন্দোলনে সর্বতোভাবে যোগ দেন। ওই সময় পশ্চিমবঙ্গে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের সাধারণ সম্পাদক ছিলেন (অধুনা স্বর্গত) ঢাকুরিয়ার বিখ্যাত মুখার্জি পরিবারের শ্যামাপদ মুখোপাধ্যায়।

পত্র-পত্রিকায় রামশিলাপূজন নিয়ে পুরোদমে আলাপ-আলোচনা কটু-কাটব্য শুরু হয়ে যায়। সিপিএম-সহ অন্য বামদলগুলোর ক্যাডারবাহিনী নেতাদের উস্কানি পেয়েই ময়দানে নেমে পড়ে। প্রায় প্রতিটি রামশিলা পুজোয় প্রত্যক্ষ শারীরিক বিরোধিতা শুরু হয়ে যায়। এ যেন শারদীয়া পুজোর আগেই রাম-রাবণের লঙ্কাকাণ্ড।

হিন্দুস্থানে হিন্দু সংগঠনই সব সময় রাজনীতিবিদদের বলির পাঁঠা। রামশিলাপূজনের কথায় তেলে-বেগুনে জ্বলে ওঠে বামপন্থীরা। পশ্চিমবঙ্গের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু বলে দেন তাঁদের খাসতালুক পশ্চিমবঙ্গে ইঁট-টিট পুজো হবে না। যথারীতি হিন্দুত্ববাদী রামমন্দিরপন্থীরা শাসকগোষ্ঠীর চ্যালেঞ্জকে খোলামনে গ্রহণ করেন। বিশ্ব হিন্দু পরিষদের তদানীন্তন পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ সমিতির সদস্য ড. প্রীতিমাধব রায় বলেন, সংবিধান প্রদত্ত ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকার রয়েছে। আমরা যা খুশি পুজো করতে পারি।

রামশিলা পুজোর বিরোধিতায় নামে শাসক দলের ভৈরববাহিনী এবং তাদের সহযোগী দাসানুদাস 'পুলিশ-প্রশাসন' এবং অতিবাম রাজনীতিক দলের ক্যাডাররা। তবে কিছু ব্যতিক্রম অবশ্যই ছিলেন। তখনকার পশ্চিমবঙ্গের পুলিশ প্রধান বিকাশকলি বসুকে এরকম ব্যতিক্রমী হিসেবেই গণ্য করা যায়। যতদূর মনে আছে সর্বপ্রথম পশ্চিমবঙ্গে শ্রীরামশিলা পূজন হয়েছিল ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের প্রধান কার্যালয় বালিগঞ্জে— বিশ্ব হিন্দু পরিষদের প্রাদেশিক কর্মকর্তাবৃন্দ এবং ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের উদ্যোগে। মূল উদ্যোক্তা ছিলেন ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের স্বনামধন্য সন্ন্যাসী এবং সর্বজনশ্রদ্ধেয় সুবক্তা স্বামী বিজয়ানন্দ মহারাজ।

দক্ষিণ কলকাতায় বিজয়গড়ে শ্রীশ্রীদুর্গাপুজোর সময় প্রধানত স্থানীয় কংগ্রেসীদের উদ্যোগে ভারতমাতার পুজো হয়। এই পুজো একসময় শুরু করেছিলেন ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের অনুগামীরা। পরে তা চালিয়ে যাচ্ছেন এখনকার কংগ্রেসীরা। ১৯৮৯ সালে দক্ষিণ কলকাতার বিজয়গড় ময়দানে ভারতমাতা পুজোর উদ্বোধনে আমন্ত্রিত হন স্বামী বিজয়ানন্দ এবং ড. ধ্যানেশনারায়ণ চক্রবর্তী। সম্ভবত চতুর্থী বা পঞ্চমীর দিন ওই অনুষ্ঠান হয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ড. ধ্যানেশনারায়ণ চক্রবর্তী প্রসঙ্গ উত্থাপন করে জ্যোতি বসুকে 'কুলাঙ্গার' বলে মন্তব্য করেন। ফলে দৈনিক খবরের কাগজগুলো ভালো ঝাল-মশলা পেয়ে যায় পরিবেশন করার জন্য।

রামশিলা পুজো নিয়ে রীতিমতো রাজনীতি শুরু হয়। প্রশ্ন ওঠে কোনো রাজনৈতিক দল সমর্থন করবে কিনা! একমাত্র ব্যতিক্রম ভারতীয় জনতা পার্টি। দলের পালমপুর (হিমাচল প্রদেশ) অধিবেশনেই শ্রীরামজন্মভূমিতে মন্দির পুনর্নির্মাণের সমর্থনে এক প্রস্তাব গৃহীত হয়। দলের সর্বোচ্চ সমিতির এই প্রস্তাব গ্রহণের ফলে দলের সর্বস্তরে শ্রীরামমন্দিরের জন্য যাবতীয় আন্দোলনে সর্বস্তরে ব্যাপক সমর্থন লাভ করে।

পশ্চিমবঙ্গে গ্রামে-গ্রামে, পাড়ায়-পাড়ায়, মন্দিরে-মন্দিরে শ্রীরামশিলা পূজনের প্রস্তুতি শুরু হয়ে যায়। পুজোর আগে থেকেই বামপন্থীরা বিরোধিতা শুরু করে। দক্ষিণ কলকাতার শ্রীকলোনী মোড়ে পথসভায় হামলা চালায় সিপিএম মদতপুষ্ট মস্তানরা। তারা প্রচারগাড়ি ভাঙচুর করে মাইক লুট করে নিয়ে যায়। প্রত্যক্ষদর্শীদের মতে দুই মস্তান হলো কুখ্যাত 'ছানু ও পিনপিন'। আরও অনেকে ছিল। জনৈক সিটু নেতা তাতে নেতৃত্ব দেন। যাদবপুর থানায় বিশ্ব হিন্দু পরিষদের পক্ষ থেকে এফ আই আর করা হয়। বলাবাহুল্য কোনো কাজ হয়নি। দুর্গাপুজোর সময় তদানীন্তন বিজেপি কাউন্সিলার শান্তিলাল জৈন পূজামণ্ডপেই শ্রীরামশিলা পূজা করেন। ওদিকে রাজধানী দিল্লীতেও বিজেপি-র সর্বভারতীয় নেতা লালকৃষ্ণ আদবানী একইরকম পদ্ধতিতে দুর্গাপূজামণ্ডপে শ্রীরামশিলা পূজা করেন। ফলে সারা দেশজুড়ে সদর্থক রামভাবনা ও রামভক্তির পরিবেশ তৈরি হয়। ভক্তিতেই শক্তি। তাই বামেরা এই আপামর রামভক্তিকে কিছুতেই সহ্য করতে

পারছিল না। তারা সর্বতোভাবে এই অনুষ্ঠান বানচাল করতে উঠেপড়ে লাগে। ইতিমধ্যেই তৈরি হয়ে গিয়েছিল 'বাবরি মসজিদ অ্যাকশন কমিটি'। ফলে দেশজুড়ে মুসলমান সমাজকে বাবরের নাম করে মসজিদের সুড়সুড়ি দিয়ে পিছন থেকে লড়িয়ে দেওয়ার অপচেষ্টা হয়। কিছু কিছু ক্ষেত্রে এই প্রয়াস সফল হয়।

বর্ধমান জেলার গলসী থানার পোড়শুড়া গ্রামে হিন্দুরা শ্রীরামশিলা পূজনের ব্যবস্থা করলে মুসলমানরা সেখানে আক্রমণ করে। ভাঙচুর চালায়। যথারীতি খবর পেয়ে পুলিশ আসে এবং শিলাপূজন স্থগিত করে শান্তিভঙ্গের আশঙ্কায়। রাতভর উত্তেজনা। পুলিশ মোতায়েন। এদিকে নিরস্ত্র হিন্দুরা রাগে ক্ষোভে অপমানে ফুঁসছে। রাত্রি প্রায় একটা নাগাদ আসরে অবতীর্ণ হলেন বর্ধমান জেলার পুলিশ সুপারিন্টেনডেন্ট নওলকিশোর সিং। উনি রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের তৎকালীন জেলা প্রচারক অমরকৃষ্ণ ভদ্রকে অনুরোধ করে রাজি করালেন— আপাতত রামশিলা পূজন বন্ধ রাখতে। কথা দিলেন, নতুন দিন ঠিক করে নিরাপত্তার বন্দোবস্ত করে নিজে উপস্থিত থেকে শিলাপূজন অনুষ্ঠান করাবেন। পরে তিনি কথা রেখেছিলেন। তিনদিন বাদেই একই স্থানে শিলাপূজন সুসম্পন্ন হয়। কলকাতার একটি ঘটনার উল্লেখ না করলে শিলাপূজনের কথা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। বাঘাযতীন এলাকার শ্রীকলোনীমোড় থেকে ভিতর দিকে একটু গিয়ে গেলেই মাঠের পাশে অ্যাডভোকেট দেবীদাস গাঙ্গুলির বাড়ি। দেবীদাসবাবু ছোটবেলা থেকেই রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের স্বয়ংসেবক। তিনি সর্বসমক্ষে ঘোষণা করলেন বাড়িতে ঘটা করে শ্রীরামশিলাপূজন করবেন। যেমন বলা, তেমনই কাজ। বাড়ির সামনে ম্যারাপ বেঁধে অনুষ্ঠান। সকাল থেকেই যাদবপুর থানা থেকে একভ্যান পুলিশ হাজির। ভারতবর্ষে পুজোর উদ্দেশ্যই হলো শান্তি, বিশ্বশান্তি, বিশ্বমঙ্গল কামনা। দিকে দিকে উচ্চকণ্ঠে ঘোষিত হয় 'সর্বমঙ্গলামঙ্গল্যে শিবে সর্বার্থসাধিকে...'। অশান্তির কোনো প্রশ্নই নেই। তবুও অশান্তি অশান্তি বলে অশান্তি বাঁধানোর রাজনৈতিকভাবে যাবতীয় অপপ্রয়াস চলেছিল পুরোদমে। পুজো হল, হলো খিচুড়ি প্রসাদ বিতরণ। উপস্থিত পুলিশকর্মীরাও প্রসাদ পেয়ে ধন্য। রাইটার্সে নিউসেক্রেটারিয়েট বিল্ডিং-এ কর্মরত এক বন্ধু খবর দিলেন— দেবীদাসদার বাড়িতে পাড়ার কমরেড বন্ধুরা রামশিলা পুজোর খিচুড়ি প্রসাদ খেয়ে এসেছে। কমরেডদের নাক কাটা গেল। হৈহৈ রৈরৈ হলো রাইটার্সে।

উত্তেজনার পারদ সব থেকে চড়ে ঐতিহাসিক করুণাময়ী কালীমন্দিরে শ্রীরামশিলাপূজন অনুষ্ঠান নিয়ে। পুরোহিতমশায়



কলকাতার শহীদ করসেবক ভাই রাম ও শরদ কোঠারী।

শ্রীরামশিলাপূজন করবেন জেনে ঠাকুরপুকুর থানার ও.সি. তাঁকে শাসিয়ে যান। এই নিয়ে সংবাদপত্রে চাপানউতোর শুরু হয়। স্থানীয় জনসাধারণের পক্ষ থেকে ডেপুটেশন দেওয়া হয় একেবারে তৎকালীন রাজ্য পুলিশ মহানির্দেশক শ্রীযুক্ত বিকাশকলি বসুকে। তিনি সদর্থক আশ্বাস দেন। পুজোর দিন সকাল থেকেই দু'গাড়ি পুলিশ মোতায়েন হয় মন্দিরের বাইরে। সর্বত্র রটে যায় পুজো বন্ধ করতে আক্রমণ হতে পারে। স্থানীয় কর্মকর্তা রবীন্দ্রলাল ব্যানার্জির নেতৃত্বে এলাকার জনসাধারণ হিম্মতের সঙ্গে রুখে দাঁড়ান। পুজো শুরু হতেই বিরাট মন্দির চত্বর লোকে লোকারণ্য হয়ে যায়। মাতৃমূর্তির সামনে মহাসমারোহে শ্রীরামশিলাপূজন অনুষ্ঠান হয়। কিছু সাংবাদিক বন্ধু এসেছিলেন। নির্বিঘ্নে সবকিছু সম্পন্ন হতে তাঁরা হতাশ হয়ে ফিরে গেলেন। খবর করার রসদ পেলেন না। এসময় কলকাতার মানিকতলার এক মন্দিরে পুজোতে বাধা দেয় সিপিএম মদতপুষ্ট সমাজবিরোধীরা। বাধা দেওয়া হয় সল্টলেক সংলগ্ন মহিষবাথানে।

বাধার মধ্যেই পশ্চিমবঙ্গে প্রায় চার হাজার স্থানে শ্রীরামশিলা পূজন হয়। দক্ষিণ কলকাতার বেশ কয়েকটি মন্দিরে শ্রীরামশিলাপূজন হয়। তাদের মধ্যে যাদবপুরের শ্রীশ্রীসত্যানন্দ দেবায়তন অন্যতম। শিলাপূজন হয় বাঁশদ্রোণীর প্রাক্তন জমিদার প্রয়াত হীরেন্দ্রলাল সরকারের বাড়িতে। সেখানে স্পেশাল ব্রাঞ্চের এক ক্যামেরাম্যান ছবি তুলতে এসেছিলেন। সেবছর (১৯৮৯) হরিদ্বারেই ঠিক হয়েছিল ৯ নভেম্বর অযোধ্যায় শ্রীরামজন্মভূমিতে অনুপম মন্দির নির্মাণের দ্বিতীয় ধাপে শিলান্যাস হবে। যতই দিন এগোতে থাকে উত্তেজনা চরমে পৌঁছয় রাজধানীতে। শিলান্যাস নিয়ে রাজধানীর রাজনীতি উত্তপ্ত হচ্ছিল। এদিকে কলকাতায়ও উত্তেজনা দেখা দিল যখন ঘোষণা হয়— কলকাতার চারটি স্থান থেকে পূজিত শ্রীরামশিলা নিয়ে রামভক্তরা শোভাযাত্রা সহকারে কলকাতার প্রাণকেন্দ্রে ময়দান এলাকায় সম্মিলিত হয়ে জনসভা করবেন। সেই জনসভায় উপস্থিত থাকবেন বিশ্ব হিন্দু পরিষদের আন্তর্জাতিক সংগঠন সম্পাদক শ্রী অশোক সিংহল।

জনসভার স্থানের আর্জি জানাতেই নিরাপত্তা ও আইনশৃঙ্খলার অবনতির অজুহাতে ব্রিগেড প্যারেড ময়দান ও শহীদ মিনার ময়দান পুলিশের পক্ষ থেকে নাকচ করে দেওয়া হয়। এমনকী শোভাযাত্রার অনুমতি দিতেও সরকার ও প্রশাসন রাজি নয়। '৮৯ নভেম্বরের ৫ তারিখ জনসভার দিন নির্ধারিত ছিল। তখন শ্রীরামশিলা পূজন সমিতির তাবৎ কাজকর্ম পরিচালিত হোত বিশ্ব হিন্দু পরিষদের প্রাদেশিক কার্যালয়



A World-class (B+G+7 Storied) office building, in the heart of the central business district, on 27, Bentinck Street, Kolkata - 700 001

BY

M K GROUP

Contact no. 033-32901999

www.mkpoint.in

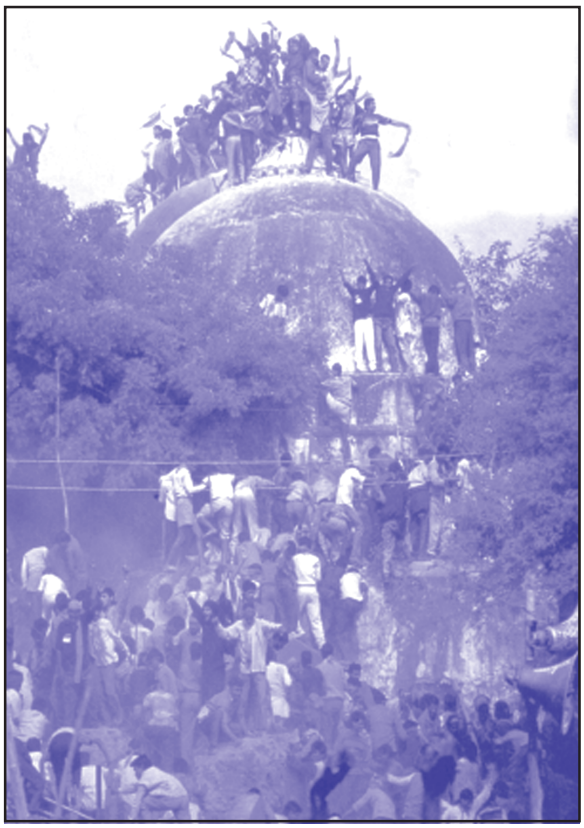
Best wishes from -

A Well Wisher

৩৩, ভূপেন বোস এভিনিউ থেকে। প্রশাসন ও পুলিশ কর্তৃপক্ষের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগের জন্য এক ছোট্ট কমিটি গড়া হয়। সেই সমিতিতে ছিলেন সর্বজনশ্রদ্ধেয় অধ্যাপক বিষ্ণুকান্ত শাস্ত্রী। যিনি পশ্চিমবঙ্গ বিজেপি-র সভাপতি ছিলেন। পরবর্তীকালে উত্তরপ্রদেশ এবং হিমাচল প্রদেশের রাজ্যপাল হয়েছিলেন। এছাড়া ছিলেন স্বনামধন্য হৃদ্‌রোগ বিশেষজ্ঞ ডাঃ সুজিত ধর। তিনি রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের কলকাতা মহানগর সঙ্ঘচালক, বিশ্ব হিন্দু পরিষদের কেন্দ্রীয় অছিপরিষদের সদস্য এবং পরে কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি। এছাড়া কিংকর তপানন্দ মহারাজ এবং ড. প্রীতিমাধব রায়। কিছুতেই কোনো জায়গা এবং শোভাযাত্রার অনুমতি দিতে পুলিশ এবং প্রশাসন রাজি নয়। আর মাত্র একদিন বাকি। শেষে দেশলাই বাক্সের সাইজের একটা ছোট্ট জায়গার অনুমতি দেয় প্রশাসন ও পুলিশ। ময়দানে টেরিটোরিয়েল আর্মি ইন্সস্টিটিউট-এর পাশে। সেখানেই মঞ্চ হলো। একটাই শোভাযাত্রার অনুমতি পাওয়া গেল। তাও আবার জোড়াবাগান পার্ক থেকে বড়বাজার হয়ে গঙ্গার পাড় ধরে রেডরোড হয়ে ওই মাঠ।

শেষমেষ প্রশাসনের নির্দেশমতোই জোড়াবাগান থেকে নির্ধারিত পথেই শোভাযাত্রা হয়। হাওড়া, শিয়ালদা ও অন্যান্য জায়গা থেকে রামভক্তরা আসছে তো আসছেই, শেষ হওয়ার নামগন্ধ নেই। বামপন্থী সরকারের দাসানুদাস পুলিশ ভেবেছিল ২/৪ হাজার লোক হবে। জোড়াবাগান পার্ক থেকে শোভাযাত্রায় সবার সামনে সর্বশ্রী অশোক সিংহল, ডাঃ সুজিত ধর, গোপালভাই আসর, বালকৃষ্ণ নাইক,বিভিন্ন মঠ, মত-পন্থের সন্তবৃন্দ। পিছনে আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সর্বসাধারণ অগণিত রামভক্ত। নভেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহেও ভরদুপুরে বেশ কড়া রোদ। তবে পরোয়া নেই। এক অপার্থিব, অনাবিল বাঁধভাঙ্গা আনন্দ মুখর পরিবেশ। একটাই ধ্বনি 'জয় শ্রীরাম'। আর তা বার বার কলকাতার আকাশ বাতাস কাঁপিয়ে দিচ্ছে। এছাড়া মন্দির গড়ার শপথ তো রয়েইছে। যে অযুত-কোটি মানুষের স্বপ্ন আজ সফল হতে চলেছে এলাহাবাদ হাইকোর্টের রায়ে। রাস্তায় স্থানে স্থানে জলসত্র। তবে জলসত্র না বলে বলা উচিত সরবতসত্র। সরবত পান করাচ্ছেন যিনি তিনিও রামভক্ত, যাঁরা পান করছেন তাঁরাও রামভক্ত। সকলের একটাই পরিচয়— রামভক্ত। রামভক্তি সবাইকে মিলিয়ে দিয়েছে। পুলিশ হাওড়াতে প্রথম প্রথম লোক গুনতি করছিল। তবে রামভক্তদের সংখ্যাটা শীঘ্রই ৫০ হাজার পার হতে গুনতি করা বন্ধ করে দেয় বলে খবর। আগে থেকেই নির্দিষ্ট ছিল বিশাল জনসভার প্রধান বক্তা অশোক সিংহল। ছোট্ট জায়গায় রামভক্তদের স্থান সংকুলান হচ্ছে না। মিছিলের সামনের অংশ যখন সভাস্থলে তখনও শেষ ভাগ যাত্রা শুরু করতে পারেনি।

আগে থেকেই ঠিক ছিল গ্রাম গ্রাম থেকে পূজিত শ্রীরামশিলা ময়দানে তিনদিন থাকবে। পরের দু'দিন মাতৃসম্মেলন ও যুবসম্মেলন হবে সভাস্থলে। পরদিন সকালে যথারীতি যজ্ঞ ও হোম। বাউল গানও ছিল একটু রাত্রির দিকে। গায়ক বাউলসম্রাট পূর্ণচন্দ্র দাস। চারদিকে পাহারা দিচ্ছে নিরেট বাঁশের লাঠি হাতে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের স্বয়ংসেবক ও কার্যকর্তারা। তারপর রয়েছে কলকাতা পুলিশ। খুব কায়দা



বাবরি ধাঁচা ধূলিস্যাৎ হওয়ার পূর্ব মুহূর্ত।

করে একটা গুজব রটানো হয়েছিল নেতা-মন্ত্রী ঘনিষ্ঠ ব্যবসায়ীদের দিয়ে। হঠাৎ শ্রীকলোনীতে সঙ্ঘের এক কার্যকর্তার বাড়িতে ফোনে খবর এল— হাজি মস্তান কলকাতায়। রামশিলার মিছিল আক্রান্ত হতে পারে। দক্ষিণ কলকাতার কর্মকর্তা অসীম গাঙ্গুলি দৌড়ে গেলেন (বর্তমানে প্রয়াত) সেই ব্যবসায়ী স্বয়ংসেবকের বাড়িতে। পুলিশ ছাড়া শোভাযাত্রায় নিজস্ব নিরাপত্তাব্যবস্থা ছিল। অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদের তৎকালীন প্রাদেশিক সংগঠন সম্পাদক তপন কুমার ঘোষ অঘোষিতভাবে সে দায়িত্বে ছিলেন। যুব সম্মেলনে প্রধান বক্তা ছিলেন বিশ্ব হিন্দু পরিষদের সুবক্তা উত্তম কুমার দাস (মুর্শিদাবাদ বিভাগ সংগঠন সম্পাদক)। মাতৃ সম্মেলনে আশীর্বচন দেন শ্রীশ্রী সত্যানন্দ দেবায়তনের সন্ন্যাসিনী অর্চনাপুরী মা।

বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার সাংবাদিকরা তখন প্রায় ২৪ ঘণ্টাই চত্বরে যাতায়াত করছে। একস্থানে স্তূপীকৃত রামশিলা। নির্দিষ্ট কাউন্টারে মন্দির নির্মাণকল্পে অর্থদান চলছে। দানপাত্র উপছে পড়ছে। ঘড়ি ধরে ৮ নভেম্বর বিশাল কনভয়ের যাত্রা শুরু হলো কলকাতা থেকে। প্রশাসনের সব ভ্রুকুটি উপেক্ষা করে বর্ধমান ও আসানসোল হয়ে বাংলার সীমা পেরিয়ে গেল সগৌরবে। ইতিমধ্যে সকালের কাগজে এবং টেলিফোনে আনন্দ

সংবাদ পৌঁছে গিয়েছে সকলের কাছে। আর তা হলো— অযোধ্যায় পূর্বনির্ধারিত সময়ে শিলান্যাসের নির্ঘণ্ট মেনে নির্ধারিত স্থানেই শিলান্যাস সুসম্পন্ন হয়েছে। উপস্থিত ছিলেন সারা দেশের বিশিষ্ট সন্ত-মহাত্মা এবং হিন্দু নেতৃবৃন্দ। মহন্ত অবৈদ্যনাথ মহারাজ, শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য বাসুদেবানন্দ সরস্বতী, সাধ্বী ঋতম্ভরা, সন্ন্যাসিনী উমা ভারতী, রাজমাতা বিজয়রাজে সিন্ধিয়া, রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের তদানীন্তন সরকার্যবাহ এইচ ভি শেষাদ্রি, মোরোপন্ত পিংলে, শ্রীশচন্দ্র দীক্ষিত, ওঙ্কার ভাবে এবং আরও অনেকে। প্রথম শিলাস্থাপন করেছিলেন হরিজন সম্প্রদায়ের কামেশ্বর পাসোয়ান।

রীতিমতো অঘটনই বলা যায়। পৃথিবীর ইতিহাসে এই ঐতিহাসিক দিন ৯ নভেম্বর ১৯৮৯ সাল। প্রশাসনের পক্ষ থেকে শিলান্যাসের জন্য চিহ্নিত স্থান-সহ রামজন্মভূমি চত্বরকে (২.৭৭ একর) বিতর্কিত বলে ঘোষণা করা হয়। রাতদুপুরে রাজধানীর রাজনীতি সক্রিয় হয়। গভীর রাত্রে এলাহাবাদ হাইকোর্টের স্পেশাল বেঞ্চ বসে। হেলিকপ্টার পাঠিয়ে উড়িয়ে আনা হয় মোহন্ত অবৈদ্যনাথকে। হাইকোর্ট রায় দেয়— এলাকার বিতর্কিত শিলান্যাসস্থল অবিতর্কিত। ওখানে শিলান্যাস হতে পারে। পরের ঘটনা ইতিহাস। ভেঙে গেল বাধার প্রাচীর। একই দিনে পৃথিবীর আর এক প্রান্তে রচিত হয়েছিল আর এক ইতিহাস— ভাঙল বার্লিন প্রাচীর। দুই জার্মানি সম্মিলিত হলো ওই একই দিনে।

শিলান্যাস হলো বটে, কিন্তু সংগ্রাম এখনও অনেক বাকি। অক্টোবর, ১৯৯০। রামমন্দির নির্মাণের জন্য শুরু হলো করসেবা। সারাদেশ থেকে ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে মুলায়ম সরকারের সব বাধাকে উপেক্ষা করে করসেবকেরা অযোধ্যায় পৌঁছে গেল। অযোধ্যা ও ফৈজাবাদ তখন দুঃস্বপ্নের নগরী। সরযূনদীর সেতুর উপর নির্বিচারে গুলি চালালো মুলায়মের পুলিশ। নিহত হলেন কয়েকশো করসেবক। ২ নভেম্বর। পশ্চিমবঙ্গের করসেবকদের প্রমুখ শম্ভুনাথ ধাড়ার বিবরণে উঠে এসেছে, সেই দিনের বিবরণ— 'পরিকল্পনা মতো অধ্যাপক রাম বর্মার নেতৃত্বে বড়াভক্তামাল হয়ে যে দলটি হনুমানগড়ির দিকে গেল সেই দলে আমরা পশ্চিমবঙ্গের করসেবকরা ছিলাম। আবার শুরু হলো প্রবল লাঠিচার্জ ও কাঁদানে গ্যাস ছোঁড়া। লাঠির আঘাতে অনেকেরই মাথা ফেটে তখন রক্ত ঝরছে। সবাই এদিক-ওদিক ছোটাছুটি করছি। পরক্ষণেই গুলির আওয়াজ। সামনেই পাঁচ-সাতজন লুটিয়ে পড়লো। কয়েকজনের সঙ্গে চৌরাস্তার পাশে একটা দোকানে আমরা আশ্রয় নিলাম। পুলিশ সেখানে এসেও পেটাতে শুরু করলো। আবার দৌড়। মারমুখী উন্মত্ত পুলিশও দৌড়োচ্ছে। অবশেষে একটা বাড়িতে আশ্রয়। এক ভদ্রমহিলা মই এগিয়ে দিলেন। মই বেয়ে এক ছাদ থেকে আরেক ছাদ হয়ে পাশের একটা গলির মধ্যে কয়েকজন ঢুকে পড়ে। প্রায় ১০ মিনিট ধরে একনাগাড়ে গুলির আওয়াজ শোনা গেল। মণিলাল কি ছাউনি-তে দেখা যায় বহু রামভক্তের নিষ্প্রাণ দেহ পড়ে আছে। পশ্চিমবাংলার দুই শহীদ রামকুমার ও শরৎ কোঠারীর দেহ সেখানেই পড়ে থাকতে দেখা যায়। তখন বারবার মনে পড়ছিল সেদিন সকালেই রাম পকেট থেকে একটা গৈরিক ফেট্টি বার করে আমার মাথায় পরিয়ে দিয়েছিল। বলেছিল, 'খালি মাথায় শম্ভুদা ভাল লাগে না।' শরতের মুখে সবসময় লেগে থাকতো 'একবার বিদায় দে মা ঘুরে আসি' গান।"



এলাহাবাদ হাইকোর্টের নির্দেশে খননকার্য চালিয়ে মসজিদের নীচে পাওয়া মন্দিরের অস্তিত্বের প্রমাণ। খননকার্যে উঠে আসা বহু হিন্দু দেবদেবীর মধ্যে এটি একটি।

করসেবকদের এই হত্যাকাণ্ডের উপযুক্ত জবাব দেওয়া হয়েছিল ৬ ডিসেম্বর, ১৯৯২-তে। ১৫২৮ খৃস্টাব্দে অযোধ্যায় রামজন্মভূমির উপর মুঘল সম্রাট বাবর যে ধাঁচা তৈরি করেছিল সেদিন সেই ধাঁচা ধূলিসাৎ হয়। সেদিন অযোধ্যার আকাশ বাতাসে একটাই স্লোগানে মুখরিত ছিল— 'জয় শ্রীরাম'।

২০০২ সালে এলাহাবাদ হাইকোর্ট ভারতের আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে-কে নির্দেশ দেয় ওই স্থানে খননকার্য চালাতে, যাতে তার তলায় মন্দিরের অস্তিত্ব থাকলে এর সন্ধান পাওয়া যায়। ২০০৩ সালে এদের সমীক্ষা জানিয়ে দেয় মসজিদের নীচে মন্দিরের অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে। যদিও মুসলমানেরা এই সমীক্ষার বিরোধিতা করে।

২০০৫ সালে সন্দেহভাজন ইসলামিক জঙ্গিরা তথাকথিত বিতর্কিত অঞ্চলটিতে আক্রমণ চালায়। ২০১০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে এলাহাবাদ হাইকোর্ট নির্দেশ দেয় যে স্থানটিকে তিনভাগে বিভক্ত করতে। যার এক-তৃতীয়াংশ নিয়ন্ত্রণ থাকবে হিন্দুদের হাতে, আরেক এক-তৃতীয়াংশ মুসলমানদের এবং বাকি এক-তৃতীয়াংশ নির্মোহী আখড়ার হাতে। ২০১১-র মে মাসে হিন্দু ও মুসলমানেরা আদালতের এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আবেদন করলে ২০১১-র মে মাসে সুপ্রিম কোর্ট এলাহাবাদ হাইকোর্টের নির্দেশ বাতিল করে দেয়। এ যেন অনেকটা 'শেষ হয়েও না হইল শেষ।' অযোধ্যায় শ্রীরামজন্মভূমিতে মন্দির নির্মাণ না হওয়া পর্যন্ত এই আন্দোলন চলতে থাকবেই। ■

সমাজ সেবায়ও বিশ্ব হিন্দু পরিষদ অবিচল

সুকেশ মণ্ডল

দেশ স্বাধীন হওয়ার পর শ্রেণীহীন সমাজ গঠন করার কথা ঘোষণা করা হয়। অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ আইনও তৈরি হয়, কিন্তু দেখা যায় শ্রেণীহীন সমাজ নির্মাণের পরিবর্তে জাতিগত হানাহানি ও ভেদাভেদ আরও বৃদ্ধি পাচ্ছে। আমাদের সমাজের ২০-২৫ কোটি দুর্বল, দরিদ্র ও অশিক্ষিত মানুষ সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আছে। আইন প্রণেতারা শুধুমাত্র কিছু আইন পাশ করে তাদের দায়িত্ব সেরেছেন। আমাদের সমাজের সেই ভায়েরা অন্ধকারেই পড়ে আছে। সেই সুযোগে বিদেশি মিশনারির দল তাদের লোভ দেখিয়ে ধর্মান্তরিত করে সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন করার খেলায় মেতেছে। স্বামী বিবেকানন্দ সাবধান বাণী উচ্চারণ করেছিলেন— ''আমাদের সমাজ থেকে একজন অন্য ধর্মে চলে গেলে শুধু একটি সংখ্যায় কম হয় না, একজন শত্রু বৃদ্ধি হয়।'' তাই সমাজের এই সব পিছিয়ে পড়া শ্রেণীর জন্য নিঃস্বার্থ সেবা বিশ্ব হিন্দু পরিষদ লক্ষ্য হিসেবে গ্রহণ করেছে। সেবার দ্বারা সেসব ভাইকে শিক্ষিত করা, সমাজবোধে উদ্বুদ্ধ করা এবং স্বাভিমান জাগানোর কাজ বঙ্গপ্রদেশে পরিষদের জন্মলগ্ন থেকে তাদের সেবাব্রতী কর্মীরা করে চলেছেন।

বিশ্ব হিন্দু পরিষদ হিন্দু সমাজকে সংগঠিত করার কাজে নিযুক্ত। সমগ্র হিন্দু সমাজ বিশাল এক পরিবার; কেউ উচ্চ-নীচ বা অস্পৃশ্য নয়— এই অনুভূতি জাগানোর মহান দায়িত্বকে পরিষদের কার্যকর্তারা কর্তব্য হিসেবে মেনে নিয়েছেন। সেভাবেই দেশের শিক্ষিত ও স্বচ্ছলশ্রেণীকে সমাজের দুর্বল ভাই-বোনদের সেবায় অণুপ্রাণিত করে চলেছেন। অর্থাৎ সমাজে সেবার মানসিকতা নির্মাণে পরিষদ আজ সফল। আজ দেশের মধ্যে পরিষদের লক্ষ লক্ষ সেবাব্রতী তাদের বহুমুখী সেবা ও সেবাপ্রকল্পের মাধ্যমে, প্রচারের আড়ালে থেকে পাহাড় থেকে সাগরে, জঙ্গলে নীরবে কাজ করে চলেছেন। সারা ভারতে প্রায় ১ হাজার পূর্ণকালীন সেবাব্রতী রয়েছে। এর সঙ্গে শহর ও নগরের আরো কয়েক হাজার সেবাভাবী কার্যকর্তাকে নিয়ে ৫৮,১৮১টি সেবাকাজ পরিচালনা করছেন।

বিশ্ব হিন্দু পরিষদ বনবন্ধু পরিষদ (বনবাসী সেবা প্রতিষ্ঠান)-এর মাধ্যমে পশ্চিমবঙ্গে ১৭৬৩টি একল বিদ্যালয় চালাচ্ছে। দরিদ্র বনবাসী সমাজের যে শিশুরা স্কুলে যেতে পারে না এক শিক্ষক-এর বিদ্যালয়ের শিক্ষক স্নেহভরে বনবাসী শিশুদের পড়াচ্ছেন এদৃশ্য মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, বীরভূম এবং উত্তরবঙ্গে মালদা, দিনাজপুর ও দার্জিলিংয়ের পাহাড়ে যে কেউ দেখতে পারেন। একল বিদ্যালয়ের শিক্ষক, শিক্ষিকা এবং পরিচালকমণ্ডলীর সদস্যরা শিক্ষা, সংস্কার ও গ্রামবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে বনবাসীদের স্বাস্থ্য, সচেতনতার কাজ করে চলেছেন।

মানবসেবা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে পশ্চিমবঙ্গে বিশ্ব হিন্দু পরিষদ ১৮৩টি স্থায়ী সেবাকেন্দ্র পরিচালনা করছে। এর মধ্যে মাধ্যমিক বিদ্যালয় ১টি, শিশুমন্দির ১০টি, ছাত্রাবাস ৫টি, কোচিং সেন্টার ১৮টি, লাইব্রেরি ৭টি, শিশুসংস্কার কেন্দ্র ৬টি, চিকিৎসাকেন্দ্র ৩৭টি, চক্ষু পরীক্ষাকেন্দ্র ও ক্যাম্প ৪টি, নিউরোথেরাপি কেন্দ্র ১টি, রক্তদান শিবির ২টি, গোশালা ৪টি, মন্দির ৭টি, সৎসঙ্গকেন্দ্র ৫৪টি, সেলাই প্রশিক্ষণকেন্দ্র ৪টি, টাইপরাইটিং কেন্দ্র ১টি, কমপিউটার প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ৪টি, কৃষিকেন্দ্র ৪টি, মেলাশিবির ৬টি, পুস্তক বিক্রয়কেন্দ্র ২টি, কল্যাণ মণ্ডপম্ ২টি, যাত্রী নিবাস ২টি, যোগকেন্দ্র ১টি এবং অনাথালয় ১টি।

এগুলির মধ্যে উল্লেখ করার মতো বেশ কয়েকটি প্রকল্প আজ বিশ্ব হিন্দু পরিষদকে সমাজে বিশেষভাবে পরিচিতি দান করেছে।



গোপালী আশ্রমের ছাত্রাবাস

গোপালী আশ্রম :

খড়্গপুর রেল স্টেশন থেকে প্রায় সাত কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। ১৯৭৪ সালের বিজয়া দশমীর দিন বনবাসী সমাজের কয়েকজন দরিদ্র ও অনাথ বালককে নিয়ে আশ্রমের পথ চলা শুরু। আশ্রমে প্রবেশ করতেই চোখে পড়বে সুন্দর শিবমন্দির। এই শিবমন্দিরই আশ্রমের পরিচিতি। কলকাতা ভাগচন্দ পরিবারের সহযোগিতায় এই মন্দির তৈরি হয়েছে। মন্দিরের শিলান্যাস শৃঙ্গেরী মঠের শ্রী অভিনব বিদ্যাতীর্থ মহারাজের হাতে হয়েছে। মন্দিরের দ্বারোদ্‌ঘাটন করেছেন কাঞ্চী কামকোটী পীঠের শঙ্করাচার্য জয়েন্দ্র সরস্বতী

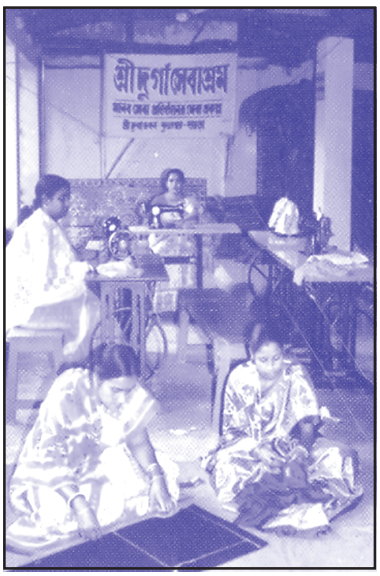
মহারাজ। মন্দিরে প্রতিদিনই ভক্তের ভিড় লেগে থাকে। শিবরাত্রি, জন্মাষ্টমী, গীতাজয়ন্তী খুব ধুমধামের সঙ্গে পালিত হয়। চারপাশের বনবাসী সমাজের মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে উৎসবে অংশগ্রহণ করে।

আশ্রমের জন্মলগ্নেই ছাত্রাবাস শুরু হয়েছে। ছাত্রাবাসে বনবাসী সমাজের দরিদ্র ও অনাথ শিশুদেরই নিঃশুল্ক থাকা ও পড়াশুনার ব্যবস্থা আছে। পড়াশুনার সঙ্গে সঙ্গে অনুশাসন, জাতীয় একতা, সংস্কৃতি ও স্বচ্ছতার শিক্ষা দেওয়া হয়। আশ্রম কর্তৃপক্ষের সেবাধর্মের পরাকাষ্ঠা দেখে মেদিনীপুরের রঘুনাথ লোঢা পরিবারের সহায়তায় একশ' ছাত্রের জন্য নতুন ছাত্রাবাস তৈরি হয়েছে। তাছাড়া এলাকার কয়েকজন শিক্ষানুরাগী ব্যক্তির উদ্যোগে আশ্রম পরিসরেই ১৯৮৮ সালে সরস্বতী শিশুমন্দির স্থাপিত হয়েছে। ১৯৯৬ সালে সারদা শিশুমন্দির শুরু হয়েছে। আশ্রমে মন্দিরের পাশেই পুস্তক বিক্রয়কেন্দ্র আছে। স্বদেশী ভাণ্ডারে নিত্যপ্রয়োজনীয় স্বদেশী জিনিসপত্র পাওয়া যায়। আশ্রমে একটি গোশালা আছে।

শঙ্করলাল সরোগীর সহযোগিতায় এটি শুরু হয়েছে। গোশালার ঘর নির্মাণের জন্য খড়্গপুরের গুজরাটি সমাজের মুনি মহারাজের প্রেরণায় গুজরাটি সমাজ অর্থ দান করেছে। গোশালার গোবর থেকে গোবরগ্যাস প্রকল্প চলে। এছাড়াও চিকিৎসাকেন্দ্র, যাত্রীনিবাস, ওয়াটার সাপ্লাই, কৃষিকেন্দ্র, গ্রন্থাগার, ভজনমণ্ডলী, বৃক্ষরোপণ প্রকল্প এলাকায় খুবই সুনাম অর্জন করেছে। এক কথায়, গোপালী আশ্রম শুধুমাত্র ধর্মীয়ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ না থেকে শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও সমাজ সেবাকে তাদের অঙ্গ করে নিয়েছে।

জালাবেড়িয়া আশ্রম :

সুন্দরবন এলাকার এই আশ্রমটি কলকাতা থেকে ৬৪ কিলোমিটার দূরে জয়নগর-জামতলা রোডে অবস্থিত। এই আশ্রমের জন্য এলাকার সহৃদয় গ্রামবাসী বেশ কয়েক বিঘা জমি দান করেন ১৯৮২ সালে। আশ্রমে মোট ১২টি প্রকল্প চলে। ১৯৮২ সালেই আশ্রমে একটি প্রাথমিক ও একটি



মহিলা স্বনির্ভর শিক্ষা কেন্দ্র।

মাধ্যমিক স্কুল শুরু হয়। আশ্রমের ছাত্রাবাসে বনবাসী সমাজের ছাত্ররাই থাকে। আশ্রমের লাইব্রেরি ও রিডিংমে ছাত্রাবাস ও গ্রামের ছাত্রছাত্রীরা নিয়মিত পড়াশুনা করে। হোমিওপ্যাথি চিকিৎসাকেন্দ্রে প্রতিমাসে ৫০০ থেকে ৭০০ রোগীকে ডাক্তাবাবুদের দ্বারা চিকিৎসা করানো এবং ওষুধ দেওয়া হয়। সেলাই প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে আশ্রম এবং গ্রামের সপ্তম ও অষ্টমশ্রেণীর মেয়েদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। এছাড়া, শারীরশিক্ষা কেন্দ্র, কৃষিকেন্দ্র, পানীয় জল, চক্ষু পরীক্ষা কেন্দ্র সফলতার সঙ্গে চলছে। নানাবিধ ফলের গাছ আশ্রমের শোভাবর্ধন করছে। সেবাভাবী কার্যকর্তা নির্মল সামন্ত খুবই সুচারু রূপে আশ্রমকে কেন্দ্র করে সেবাকাজ পরিচালনা করছেন।

গঙ্গাসাগর প্রকল্প :

গঙ্গাসাগর দ্বীপে ৩ বিঘা জমির ওপর প্রকল্পটি অবস্থিত। এখানে একটি নিঃশুল্ক পাঠদান কেন্দ্রে (কোচিং সেন্টার) এলাকার ছাত্রছাত্রী অভিজ্ঞ শিক্ষকদের দ্বারা পড়ানো হয়। সাপ্তাহিক সৎসঙ্গ কেন্দ্রের মাধ্যমে এলাকার জনসাধারণের মধ্যে ধর্মীয় চেতনা জাগ্রত করানো হয়। এই কেন্দ্রটি মূলত যাত্রীনিবাস হিসাবেই দেশের মধ্যে পরিচিত। গঙ্গাসাগর তীর্থে সারা বছরই তীর্থযাত্রীর ভিড় লেগে থাকে। গঙ্গাসাগর মেলার সময় ১৫ হাজার তীর্থযাত্রীর থাকার ব্যবস্থা আছে। এই প্রকল্প থেকে গঙ্গাসাগর মেলার সময় মেলাপরিসরে তিন দিনের অস্থায়ী শিবির করা হয়। অস্থায়ী শিবিরে প্রায় ৫ হাজার তীর্থযাত্রীর রাত্রিবাসের ব্যবস্থা থাকে।

তিনদিনে ২০ হাজার তীর্থযাত্রীর ভোজনের ব্যবস্থা করা হয়। এ সময় প্রায় ১০০ জন কার্যকর্তা দিনরাত অক্লান্ত পরিশ্রম করে শিবির পরিচালনা করেন।

ফুলেশ্বর সেবাকেন্দ্র :

কলকাতা থেকে প্রায় ৩০ কিলোমিটার দূরে ফুলেশ্বর স্টেশনের পাশে এই সেবাকেন্দ্র অবস্থিত। এই প্রকল্পের উল্লেখযোগ্য হলো কমপিউটার প্রশিক্ষণ কেন্দ্র। ২০০৯ সাল থেকে শুরু হয়েছে। বর্তমানে ৬টি শিফটে ১৮০ জন ছাত্রছাত্রী প্রতিদিন প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে। ৪ জন অভিজ্ঞ শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়।

হোমিপ্যাথি চিকিৎসাকেন্দ্রে প্রতিমাসে প্রায় ৩০০ রোগী চিকিৎসার সুযোগ পান। ফ্রি কোচিং সেন্টারে পঞ্চমশ্রেণী থেকে নবমশ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষা দেওয়া হয়। শিশুসংস্কার কেন্দ্রে প্রতিদিন ১৬/১৭ জন শিশু অংশগ্রহণ করে। সেলাই প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে বছরে ২৫ জন মহিলা প্রশিক্ষণ গ্রহণের সুযোগ পান। চক্ষুপরীক্ষা কেন্দ্রে গত বছর ৪১০ জন চক্ষুপরীক্ষার সুযোগ পেয়েছেন।

এছাড়াও মালদা জেলায় লালপুরবোদরা আশ্রম, পশ্চিম মেদিনীপুর জেলায় ঝাড়গ্রাম প্রকল্প, নদীয়া জেলায় কৃষ্ণনগর প্রকল্প, হাওড়া জেলায় পোদরা ও আমতা প্রকল্প, পূর্ব মেদিনীপুর জেলায় ভগবানপুর প্রকল্প, হাওড়া শহরে মল্লিক ফটকের কাছে বাদামীদেবী শিশু কল্যাণকেন্দ্র খুব উল্লেখযোগ্য ভাবে সেবাকাজ পরিচালনা করে জনমানসে মর্যাদার স্থান অধিকার করেছে।

এভাবেই সেবা, সংস্কার ও স্বাবলম্বনের মাধ্যমে বিশ্ব হিন্দু পরিষদ নিরলসভাবে, নীরবে সমাজের পিছিয়ে পড়া মানুষের সর্বাঙ্গীন বিকাশের জন্য নিরন্তর কাজ করে চলেছে।

আলাপচারিতায় বিশ্ব হিন্দু পরিষদের প্রাক্তন রাজ্য সম্পাদক ড. সীতানাথ গোস্বামী

‘গীতা-কে জাতীয় গ্রন্থ করা হোক’

সারথি মিত্র

শীতের রাতটা বেশ জাঁকিয়েই বসেছিল। একে সেদিন কলকাতার অবস্থা বেশ টালমাটাল। সারদাকাণ্ডে রাজ্যের এক মন্ত্রীকে গ্রেপ্তারির ঘটনায় কলকাতা জুড়ে যে তাণ্ডব চলছিল তাতে কলকাতার দক্ষিণ-প্রান্তে পৌঁছতে বেশ রাত-ই হয়ে গেল। অত রাতেও দোতলা থেকে হাসিমুখে নেমে এলেন এক শান্ত সৌম্যদর্শন বৃদ্ধ। বয়স আশি ছাড়িয়েছে কয়েক বছর আগেই। তবে পুরোনো স্মৃতি এখনো টাটকা। মাঝে মাঝে কিছু কিছু বক্তব্য যে গুলিয়ে যাচ্ছিল না তা নয়, তবে সেগুলির সংশোধন করছিলেন নিজেই এবং খুব তাড়াতাড়ি। তিনি সংস্কৃতের প্রাজ্ঞ অধ্যাপক, বিশিষ্ট চিন্তাবিদ ও অধ্যাপক ড. সীতানাথ গোস্বামী। সবকিছু ছাপিয়ে তিনি নিজেকে একজন স্বয়ংসেবক হিসেবে ভাবতেই ভালোবাসেন। বললাম, আপনার কাছে এসেছি পুরোনো দিনের গল্প শুনতে। শুনে স্মিত হাসলেন। আসলে এখনকার বিষয়ে কথা বলতে তাঁর একপ্রকার অনীহা। স্বাভাবিক, কারণ একালের সমাজের নৈতিক অধঃপতন তাঁকে ব্যথিত করেছে। সেকালের সঙ্গে তাকে মেলাতে পারেন না কিছুতেই।



তিনি আদতে নবদ্বীপের স্বয়ংসেবক। মহাপ্রভু পাড়ার বাসিন্দা। ১৯৪২-এ ভারত-ছাড়ো আন্দোলনে দেশবাসী যখন উত্তাল, তখন তিনি নবম শ্রেণীর ছাত্র। সেই সময় নবদ্বীপে আর এস এসের প্রচারক ছিলেন শ্রদ্ধেয় কালিদাস বসু। তখনই হরিসভা পাড়ায় সঙ্ঘের শাখায় আসেন তিনি। বয়স তখন মাত্র এগারো-বারো। শাখা-কে মনে হয়েছিল খেলার চমৎকার জায়গা। তাই আসা। সতীর্থ হিসেবে পেয়েছিলেন সমবয়সী বেণু ভট্টাচার্য, সত্যরঞ্জন সাহা, শিবেন কর্মকার, রমেন কুণ্ডুদের। এই প্রসঙ্গে তাঁর পারিবারিক বনেদিয়ানার ব্যাপারটি সেরে ফেলা যাক। পণ্ডিত আনন্দগোপাল গোস্বামী ছিলেন তাঁর পিতৃদেব। চৈতন্যদেব-পত্নী বিষ্ণুপ্রিয়ার ভাই যাদবাচার্যের বংশধর তাঁরা। তিনি হলেন যাদবাচার্যের অধস্তন একাদশ পুরুষ। বাবা ছিলেন সেকালের আদর্শবাদী স্কুল শিক্ষক। পিতৃদেবের কাছেই পরবর্তীকালে সংস্কৃত নিয়ে পড়ার প্রেরণা পেয়েছিলেন তিনি। তাঁর মায়ের নাম কল্যাণী দেবী। সেলিমপুরে যাঁর নামাঙ্কিত বাসগৃহে বর্তমানে রয়েছেন সীতানাথবাবুরা। তাঁরা চার ভাই, দুই বোন।

১৯৪৪-এ ম্যাট্রিক, ১৯৪৬-এ ইন্টারমিডিয়েট পাশ করে কলকাতায় পড়তে এসেছিলেন একপ্রকার নিঃস্ব অবস্থায়। নবদ্বীপ কলেজের অধ্যাপক নরেশ চক্রবর্তী তাঁর অধ্যাপক ড. সাতকড়ি মুখোপাধ্যায়কে চিঠি লিখে দিয়েছিলেন। এই সাতকড়িবাবু তাঁর কলকাতা-জীবনের প্রথম পর্যায়ে মস্ত বড় সহায় হয়েছিলেন। তাঁর বাড়িতে এককালে ভোজন সারতেন সীতানাথবাবু। যে সময় তিনি কলকাতায় এসে পৌঁছোন তখন দেশভাগের উত্তাল সময়। আর এস এস-এর কাজে অতি সক্রিয়ভাবে জড়িয়ে পড়েন তিনি। কথাপ্রসঙ্গে জানালেন, ‘ছাত্র-পড়িয়ে জীবিকা চালিয়েছি তখন। থাকতাম সিটি কলেজ হোস্টেলে। থাকবার জন্য কোনো টাকা লাগতো না। কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন ইংরেজির অধ্যাপক অমিয় সেন। আমার সঙ্গে কথা বলে তিনি খুশি হয়েছিলেন। তখনো স্কলারশিপ অনুমোদিত হয়নি। কিন্তু হোস্টেলে আমার থাকাটা বিনামূল্যে করে দিয়েছিলেন তিনি।’ গান্ধী হত্যার মিথ্যা মামলায় আর এস এসকে ফাঁসিয়ে নিষিদ্ধ করার প্রেক্ষিতে দেশজুড়ে সত্যাগ্রহ শুরু করেন স্বয়ংসেবকরা। হোস্টেলে ফিরে পুলিশের নজরদারির মুখে অনবরত পড়তে হচ্ছিল তাঁকে। এদিকে সত্যাগ্রহ শুরু হবার কয়েকদিন পরও তাঁদের গ্রেপ্তার না করায় নিজেরাই থানায় গিয়ে ধরা দেওয়ার মজার গল্পও শোনালেন তিনি। ১৯৪৯-এ নিষেধাজ্ঞা উঠে গেলে জেল থেকে মুক্তি পান। সেই সময়ের সঙ্ঘ-কাজের একটি আকর-দলিল তিনি। বলছিলেন সেসব কথা : পড়াশুনোয় মোটামুটি ভালই ছিলাম আমি। কিন্তু তখন দেশগড়ার তাড়নায় রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের কাজে এতটাই জড়িয়ে পড়ি যে পড়াশুনোয় সাময়িকভাবে অমনোযোগী হয়ে পড়ি। ১৯৪৯-এ সঙ্ঘের বিস্তারক হয়ে বর্ধমানের একটা গ্রামে যাই। ১৯৪৫-এ সঙ্ঘ শিক্ষা বর্গ প্রথম বর্ষ করি। ’৪৭-এ দ্বিতীয় বর্ষ, আর তৃতীয় বর্ষ হয় ১৯৫১-তে। নবদ্বীপেও সঙ্ঘকাজকে দাঁড় করানোর ভার পড়ে আমার ওপর। ফলে নবদ্বীপ-কলকাতা যাতায়াত চলতে থাকে। ইতিমধ্যে কলেজের চতুর্থ বর্ষের টেস্ট পরীক্ষা হয়ে যায়। কিন্তু আমি জানি না। কলেজ হোস্টেলের সুপারিটেনডেন্ট ছিলেন মনোরঞ্জন সেনগুপ্ত। তাঁর মধ্যস্থতায় কলেজের অধ্যক্ষ অমিয় সেন জানালেন যেদিন আমি দেখা করতে গিয়েছি সেইদিনই পরীক্ষা দিতে হবে। পাশ করলে তবেই বসতে পারব ফাইনালে। আমি তো রাজি। যেভাবেই হোক ফাইনালে বসতেই হবে। এম সেনের পুত্র শৈলেশ সেন নিলেন ইংরেজির পরীক্ষা। ১০০-য় ৪৫ পেয়ে উতরে গেলাম। বাংলার অধ্যাপক ছিলেন

সাহিত্যিক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়। আমার ওপর তাঁর অগাধ আস্থা। সুতরাং পরীক্ষা দিতে হলো না, পাশ করে গেলাম। দর্শনের ক্ষেত্রেও ব্যাপারটা একই ঘটল। সংস্কৃতে ছিল আমার অনার্স। পরীক্ষা নিলেন সত্যেন সেন। ৬০ পেলাম। এভাবে টেস্টে উতরে ফাইনালে বসে প্রথম শ্রেণীতে দ্বিতীয় হলাম স্নাতকস্তরে। সঙ্ঘ-কাজে সময় দিতে গিয়ে একবছর এম এ পড়িনি। পরে ১৯৫২ সালে রেকর্ড নম্বর নিয়ে এম এ-তে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হলাম।'

একসময় প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, 'যেদিন আয় করব, সেদিন আর ছাত্রদের কাছ থেকে টাকার বিনিময়ে পড়াব না।' কারণ তাঁর শিক্ষকরা তো কোনোদিন তাঁর কাছ থেকে টাকা নেননি। সারা জীবন এ আদর্শে তিনি অবিচল থেকে ছিলেন। শিক্ষক-ছাত্র সম্পর্কের এহেন আদর্শ-ই তাঁকে অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদের মতো জাতীয়তাবাদী ছাত্র-সংগঠন করতে অনুপ্রেরণা যুগিয়েছিল। তিনি পরিষদের রাজ্য সম্পাদক হন ১৯৫৭ সালে, যখন সভাপতি ছিলেন শ্যামাপ্রসাদ-অগ্রজ রমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। পরে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের সঙ্গেও যুক্ত হন তার প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে। আজ সেই প্রতিষ্ঠান সুবর্ণ-জয়ন্তী পালন করতে যাচ্ছে জেনে আনন্দ পেয়েছেন। পরিষদের রাজ্য সম্পাদকের দায়িত্বও পালন করেছেন। তিনি একজন কৃতী অধ্যাপকও বটে। ১৯৫৬ সালের যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে লেকচারার হিসেবে যোগ দেন। ১৯৬১ সালে রিডার হন। তাঁর ইন্টারভিউ বোর্ডে ছিলেন বিচারপতি শম্ভু বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো মানুষ। তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল ব্রহ্ম কেমন? তিনি উত্তর দিয়েছিলেন ব্রহ্ম অখণ্ড, সচ্চিদানন্দ ইত্যাদি বলা হলেও তা যে ঠিক কেমন তা বলা যায় না। উপমায় টেনেছিলেন গুরু বাধ্য ও শিষ্য বাহ্কলি-র কথা। তাঁর উত্তর বিচারপতি বন্দ্যোপাধ্যায়কে এতটাই খুশি করেছিল যে তিনি বলেছিলেন— আই হ্যাভ অ্যাপয়েন্টেড হিম রিডার। ১৯৭৪ সালে অধ্যাপক হন। পরে দীর্ঘদিন বিভাগীয় প্রধানের দায়িত্বও সামলেছেন। সুদীর্ঘকাল অধ্যাপনার সূত্রেই মনে করেন আজকের গবেষণা কিংবা ডক্টরেট আসলে মস্ত ফাঁকি। স্কুল শিক্ষা, কলেজ শিক্ষার ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার মান ও হাল দুই-ই খারাপ। সেখানে শিক্ষা মানে শিক্ষক-ছাত্রের আন্তরিক সম্পর্ক নয়, কেবল আর্থিক লেন-দেনের সম্পর্ক। সবমিলিয়ে মনে করছেন আজকের শিক্ষা সর্বাংশে অন্তঃসারশূন্য। বহুদিন সংস্কৃতে অধ্যাপনার সূত্রে জানাচ্ছেন টোল শিক্ষা আজও প্রাসঙ্গিক। বললেন, 'সংস্কৃতের সঙ্গে আধুনিক শিক্ষার কোনো বিরোধ নেই। বরং সংস্কৃত শিক্ষা প্রাচীন ভারতীয় শিক্ষার সমৃদ্ধ অতীতকেই তুলে ধরে যার উত্তরসূরি আজকের শিক্ষা।' রাষ্ট্রীয় সংস্কৃত সংস্থানের শিক্ষা পদ্ধতির কথা এই সূত্রে জানালেন। টোলশিক্ষায় বিজ্ঞান, ইংরেজি ও অঙ্ক শিক্ষার গুরুত্বের কথা বললেন। ধর্মান্তরকরণ প্রসঙ্গে স্পষ্ট প্রশ্ন ছুঁড়ে দিলেন : 'কোন ধর্মান্তরকরণ দুর্ভাগ্যজনক? হিন্দু ধর্ম থেকে বেরিয়ে আসা নয়, হিন্দুত্বের সিংহদুয়ার খুলে দিলেই ধর্মান্তরকরণ দুর্ভাগ্যজনক হয়ে যায়? আর তা নিয়ে আমরা সংসদে হইচই করি?' তিনি মনে করেন হিন্দুদের আজকের পরিবর্তিত রাজনৈতিক পরিস্থিতির সুযোগ নেওয়া দরকার। কারণ, 'কংগ্রেস-গান্ধী পরিবার মুসলমান ব্লক ভোটের লোভে সারা দেশে যে সাম্প্রদায়িক বিভাজনের বিষবৃক্ষ রোপণ করেছিলেন মমতা তাকেই মহীরুহে রূপান্তর করেছেন মাত্র।' সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, সুকুমার সেনের মতো মানুষদের সান্নিধ্য পেয়েছেন তাঁদের ছাত্ররূপে। সেই থেকেই ভারতীয় সংস্কৃতির অনুধ্যান তাঁর অস্থি-মজ্জায়। আর সেইসূত্রে জোরালো দাবি করছেন যে শ্রীমদ্ভাগবদ্ গীতাকে জাতীয় গ্রন্থ করতেই হবে। তিনি বললেন : 'গীতায় তথাকথিত হিন্দুধর্মের কথা নেই। রয়েছে বিশ্বধর্মের কথা। মানুষ হতে গেলে কী চাই, রয়েছে সে কথা। সুতরাং একে জাতীয় গ্রন্থের স্বীকৃতি দিতে কারুর আপত্তি থাকার কথা নয়।'

কথাপ্রসঙ্গে স্বস্তিকা-র কথা উঠল। লেখক হিসেবে এই পত্রিকার সঙ্গে তাঁর দীর্ঘদিনের সম্পর্ক। স্বস্তিকার কিংবদন্তী সম্পাদক ভবেন্দু ভট্টাচার্যের সঙ্গে তাঁর পারিবারিক যোগ। ভবেন্দুবাবুর ঠাকুর্দা অহিভূষণ ভট্টাচার্য ছিলেন তাঁর বাবা আনন্দগোপাল গোস্বামীর শিক্ষক। তিনি নিজেও ভবেন্দুবাবুকে ব্যক্তিগত সূত্রে চিনতেন। কলেজে পড়ার সময় 'জলতরঙ্গ' নাটকে তাঁকে অভিনয় করতে দেখেছিলেন সীতানাথবাবু। স্বস্তিকা-র সুবর্ণ জয়ন্তী বর্ষের সভাপতিও ছিলেন তিনি। আজকের প্রজন্মের প্রতি তাঁর বার্তা : 'ভারতীয় সমাজ, সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে জান। রামায়ণ, মহাভারত পড়। ভারতবর্ষকে চিনতে, জানতে পারবে।'

কথায় কথায় বেশ রাত হয়ে গিয়েছিল। অতরাতেও দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিলেন এই প্রতিবেদককে। বললেন : 'সাবধানে বাড়ি যেও। আর পৌঁছে একটা ফোন করো। নইলে চিন্তা হবে।' ■





ভারতবর্ষের ব্রহ্মকমল—'গীতা' একটি পর্যালোচনা

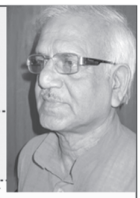
অচিন্ত্য বিশ্বাস

সম্প্রতি একটি বই প্রকাশ করেছে বিখ্যাত প্রকাশন সংস্থা রুটলেজ। লেখক এল. হারলিং ব্র্যাডলে। বইটির শিরোনাম 'The German Gita : Hermeneutics and Discipline in the German Reception of Indian Thought 1778–1831'. Hermeneutics নতুন শব্দ। এর অর্থ কোনো পুরোনো গ্রন্থের নতুন ব্যাখ্যান। ব্রাডলে এই বইতে জার্মান ভাষায় গীতার অনুবাদ এবং সেই সঙ্গে ভারতীয় জ্ঞান কাণ্ড সম্পর্কে তাঁদের ভাবনার ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া আশ্চর্য দক্ষতার সঙ্গে দেখিয়েছেন। আজকের ভারত যখন তার অতীত গৌরবকে পুনরুদ্ধার পুনর্ব্যাখ্যা ও তার মাধ্যমে নতুন জীবন-বীক্ষায় অগ্রসর— তখন এরকম একটি বইয়ের আলোচনা হওয়া খুব জরুরি। 'গীতা' কেবলমাত্র ধর্মগ্রন্থ নয়—জীবন দর্শন। আর যে কোনো জীবন দর্শনের মতোই এর একটি বিশ্বজনীন আবেদন আছে। শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতকার কৃষ্ণদাস কবিরাজ লিখেছিলেন, 'অরসিক কাক বেলের স্বাদ পায় না— তাকে খেতে হয় নিম ফল'। অতি সম্প্রতি ঘনিয়ে ওঠা গীতা-বিতর্কে এইরকম সিদ্ধান্ত করতে হয়। যাঁরা বিতর্ক করছেন তাঁরা গীতা পড়েছেন কিনা ঘোর সন্দেহ। আসলে তাঁরা ধরে নিয়েছেন গীতার মধ্যে হিন্দু ধর্মের বক্তব্যই প্রকট। সুতরাং গীতাকে জাতীয় গ্রন্থের মর্যাদা প্রদানের যে কোনো প্রয়াসই নিন্দার্হ। বিশেষত এই প্রস্তাব যখন ভারতীয় জনতা পার্টির এক নেত্রী করেছেন। শ্রীমতী সুষমা স্বরাজ বলেছেন 'গীতা' পড়ে তিনি বুঝেছেন ভারতের জাতীয় গ্রন্থ হিসাবে এই বইটিকে নির্বাচন করা উচিত। তাঁর আরও ইঙ্গিত ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্রভাই দামোদর দাস মোদী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি ওবামাকে প্রথম সাক্ষাৎকারে যে একখণ্ড গীতা উপহার দিয়েছেন— তাতেই জাতীয় গ্রন্থের ধারণাটির আভাস পাওয়া যায়। কথাটি রাজনীতির নয়। ভারতবর্ষের জ্ঞান-ভক্তি-সাধনার নির্মাণ গীতা। আমাদের জীবনযাপনের মধ্যবর্তী যে 'mildness'— শুদ্ধ বিবেচনা বোধ আছে— 'গীতা' তারই আশ্রয়।

উক্ত গ্রন্থের দ্বিতীয় ও তৃতীয় পরিচ্ছেদের নাম যথাক্রমে— 'Early Flowers of India : Johann gattfied Herder' ও 'The Bhagavatagita and Blossoming of India in Herder's thought'. জেহান গোটফিয়েড হারডার যা বলতে চান তা অত্যন্ত গভীর। তিনি মনে করেন বিশ্ব সভ্যতার মানবিক দিকটি আমাদের দেশের হিমালয় অঞ্চল ও সন্নিহিত সমতল ভূমি বরাবর— সিন্ধু- গঙ্গা-যমুনা অববাহিকায় বিকশিত হয়েছে। এই সভ্যতা সব থেকে পেলব— মধুর ও সৌরভময় ফুলের মতো। ক্রমে বিকশোন্মুখ পদ্মের মতো এর ফুটে ওঠা। আর এই বিনম্র সহজ সৌরভটি ধ্বংস করতে যারা এসেছে তারা পররাজ্যগ্রাসী— মুসলমান বা বাণিজ্যজীবী- সাম্রাজ্যবাদী ইউরোপ। গীতাকে যাঁরা শুধু একটি ধর্মগ্রন্থ বলেন তাঁদের দৃষ্টি ক্ষীণ, বিচারবোধ অবিকশিত। তাঁরা অরসিক।

১৭৮৩ নাগাদ 'গীতা' ইংরেজিতে অনুবাদ করেন চার্লস উইলকিন্স। এর আগেই গীতা একটু একটু করে ইউরোপের গবেষকদের বিশেষত জার্মান ভারততত্ত্ববিদদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। চার্লস উইলকিন্স এজন্য সংস্কৃত শিখেছিলেন। তাঁর অনুবাদটি ১৭৮৩-তে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির অর্থানুকূল্যে কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয়। অনেকের ধারণা এর আগে 'ভগবত গীতা'-র স্বতন্ত্র অস্তিত্ব ছিল না। নানা অগভীর পাণ্ডিত্য জাহির করা চলছে ইদানীং। ভারতবর্ষের আপামর জনসাধারণের জীবনে গীতার ভক্তি ও মুক্তির দর্শন তার কয়েক হাজার বছরের সাংস্কৃতিক ধারাবাহিকতার অংশ। এই সহজ সত্যটি অপ্রমাণ করার লক্ষ্যে তাঁরা বলছেন এর আগে নাকি হিন্দুরা গীতার কথা জানতেনই না! তাই যদি হবে ভারতে অতি দীর্ঘকাল ধরে গীতার যে বিভিন্ন ভাষ্য রচিত হয়েছিল তা কি মায়া?

আসন্ন প্রকাশ
শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়
কবিতা সংকলন
বাস্তব
ভূমিকা ঃ অমিতাভ চৌধুরী
₹ ১০০/



আমার কবিতা
ভূমিকা ঃ জয় গোস্বামী
₹ ৮০/

জীবনীকার মণি বাগচি
কথামৃতসার ₹ ২০০/
(শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ কথামৃত অবলম্বনে)
সৌমিক ঘোষ
প্রকৃতির পাঠশালায় ₹ ২০০/
ভীমনারায়ণ মিত্র
পশুক্লেশ মোচন মহানধর্ম ₹১৭৫/
পশুপাখিদের অধিকার বনাম
মানুষের নৃশংসতা ₹ ৩০০/
ইমানুল হক
কথাসাহিত্যের ফাঁপা দুনিয়া ₹১৫০/
ড. নবনীতা বসু হক
রবীন্দ্রনাথ : নারী সমাজ অর্থনীতি
জহর মুখোপাধ্যায় ১২৫/
সকাল বেলার বিলে ₹ ১২৫/
কেমন করে মানুষ ওড়ে ₹ ১২৫/
ময়লা হাতের খাবা ₹ ৮০
বিবেকানন্দ সাহিত্য পুরস্কার প্রাপক
গোপালকৃষ্ণ রায়-এর
জনজাতির জীবনকাব্য ₹ ১৫০/
হরিলক্ষ্মীর আত্মকথা ₹ ১৫০/
এই নারী দেহ ₹ ১৫০/

শেখর সেনগুপ্ত
সাতটি রহস্য উপন্যাস ₹ ৩৫০/
রামমিহির সেন
নানান রঙের নানা
দেশের রূপকথা ₹ ১৫০/
ড. প্রতাপ চন্দ্র চন্দ্র
পরীমহল (উপন্যাস) ₹ ৭০/
মিহির চৌধুরী
দানবিক মানবিক ₹ ১৫০/
অঞ্জুশ্রী চন্দ
কভু স্বদেশে কভু বিদেশে ₹১২৫/
শতরূপা সান্যাল
অনন্যা ও অন্যান্য ₹ ১২৫/
ডঃ চিররঞ্জন পোদ্দার
ফিরে ফিরে দেখি ₹ ১০০/
ড. শ্যামলকান্তি চক্রবর্তী
মমি রহস্য ₹ ৫০/
অজানা বামিয়ান ₹ ৬০/
সাত রাজ্যের মমি ₹ ১০০/
বইয়ের বাড়ি বেলভেডিয়ার ₹ ৭০/
অঞ্জলী দত্ত
সুরমঞ্জরী ₹ ৩০০/

প্রিটোনিয়া
পাবলিশার্স অ্যাণ্ড ডিস্ট্রিবিউটরস
১৪ বেনিয়াটোলা লেন, কল ৯ ☎ ৬৪৫৪২১০৯
e-mail : pritoniapublishers@gmail.com

ইচ্ছা থাকলেই উপায় হয়,
রোদ বৃষ্টিতে কিসের ভয়!



অক্ষয় কুমার পালের
ফোল্ডিং ছাতা
বড়বাজার,কলকাতা-৭০০ ০০৭,
ফোন ঃ ২২৪২৪১০৩

সুরেন্দ্র চন্দ্র বসাকের
অত্যাধুনিক গয়নার
ডিজাইনের ক্যাটালগ
সুপ্যার



যে কোন স্বর্ণকারকে দেখাতে বলুন
ক্যাটালগের জন্য যোগাযোগ করুন
9830950831

ALWAYS EXCLUSIVE
Vandana
SAREES
Cotton Printed Sarees
Contact - 22188744/1386

শঙ্করাচার্য বললেন— গীতা স্মৃতি হিসাবে গ্রাহ্য। রামানুজ, মাধ্বাচার্য এর দ্বৈতবাদী ব্যাখ্যা দেবার চেষ্টা করলেন— তাও মায়া? গীতায় বর্ণিত আত্মার তত্ত্ব— আত্মার অমরত্ব ও সর্বত্রগামী তত্ত্ব শুধু ঐতিহাসিক নয়, এ একান্তই আধ্যাত্মিক এবং তাকে বুঝতে হলে নিষ্ঠা দরকার, দরকার অনুধ্যান ও অনুশীলন। দু'পাতা পাশ্চাত্য জ্ঞানের দ্বারা, জড়বুদ্ধি মার্কসীয় প্রত্যয়ের মাধ্যমে গীতার মহত্ত্ব বোঝা অসম্ভব। গীতায় প্রকাশ পেয়েছে আমাদের দেশে চর্চিত ষড়দর্শনের যাবতীয় প্রস্থানের বিভিন্ন ব্যাখ্যান। জ্ঞান-ধর্ম-ভক্তির এমন অপরূপ মিশ্রণ আর নেই। সুতরাং উইলকিন্স-কৃত অনুবাদে কোনো সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্ত নেই। আছে গভীরভাবে ভারতকে আবিষ্কারের আবেগ। পরবর্তী সময়ে ফ্রিডারিখ শ্লেগেল, উইলহেলম ভন হামবোল্ট, জর্জ উইলহেলম, ফ্রেডারিখ হেগেল, উইলিয়াম বাটলার ইয়েটস, আর্থার শোপেনহাওয়ার প্রমুখ গীতা নিয়ে বিপুল আলোড়িত হন। সকলেই গীতার প্রতিপাদ্যে সমান বিশ্বাস রাখেননি। প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন। তবু গীতার দার্শনিক মূল্য তাঁরা অস্বীকার করেননি। এখানেই গীতার মহত্ত্ব। চার্লস উইলকিন্স ১৮০৫ নাগাদ গীতা-চর্চার স্বীকৃতি হিসাবে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের সাম্মানিক ডক্টরেট লাভ করেন। এই ধারাবাহিকতা স্মরণ রাখলে বোঝা যাবে কেন এই মহৎ গ্রন্থের সঙ্গে আমাদের জাতীয় গৌরবের সম্পর্ক গভীর ও ব্যাপক।

রামকৃষ্ণ গোপাল ভাণ্ডারকর তাঁর 'Vaisnavism Saivism And Minor Religious Systems' নামক অসাধারণ গবেষণাগ্রন্থে শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতা বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন (১৯১৩)। সেখানে এই মহাগ্রন্থে তাঁর সিদ্ধান্ত সাংখ্য-যোগ দর্শনের বিকাশ পর্বে, উপনিষদ সমূহের গভীর উপলব্ধি ও ভক্তিবাদের অপূর্ব বিকাশ ঘটেছে। একে তিনি 'ঐকান্তিক' ধর্ম বলে অভিহিত করেছেন। আত্মার গভীর তত্ত্ব ও পরমাত্মার সঙ্গে এক সম্মেলনের ভাব, উপলব্ধি আর জগৎ-জীবনে তার সর্বত্রসহতার অনুভব করা গীতার মূল সিদ্ধান্ত।

বালগঙ্গাধর তিলক লিখেছেন গীতার ভাষ্য। আজ যাঁরা গীতাকে জাতীয় গ্রন্থ বলার বিরোধিতা করছেন— তাঁরা এই অসাধারণ ব্যাখ্যাটি পড়ে নিতে পারেন। ছদ্ম ধর্মনিরপেক্ষতার এসব পণ্ডিতের ভাবনার উৎস দেশবিরোধী চিন্তা চেতনায় চোলাই হয়ে থাকবে। তাই জাতীয় কংগ্রেসের নেতা তিলকের ভাষ্য পড়ে দেখার সময় তাঁদের নেই!

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় গীতা সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। 'ধর্মতত্ত্ব'-গ্রন্থের (১৮৮২ খৃস্টাব্দে) ত্রয়োদশ থেকে অষ্টাদশ অধ্যায়ে এ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। তাঁর মতে ঊনবিংশ শতাব্দীর উপযোগী করে আলোচনা করার জন্য তিনি গীতা-ভাষ্যকে তখনকার প্রকাশভঙ্গিতে উপস্থাপন করেছেন। 'ভাষায় প্রভেদ' থাকলেও 'সত্য নিত্য'— সে সত্য গভীর— চিরন্তন। 'প্রচার'-পত্রিকায় ১২৯৩ বঙ্গাব্দে (১৮৮৭ খৃস্টাব্দে) তিনি লিখলেন শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতা। তাঁর মতে এই মহাগ্রন্থ পৃথিবীর যাবতীয় ধর্মগ্রন্থের মধ্যে 'শ্রেষ্ঠতম'।

ঋষি অরবিন্দ গীতার ব্যাখ্যা করেছেন। গীতার বিশ্বরূপ দর্শনের সঙ্গে তাঁর 'সাবিত্রী' মহাকাব্যের চিন্তন-ব্যাপ্তির তুলনা করেছেন কেউ কেউ। তাঁর গীতা ভাষ্য যাঁরা পড়বেন তাঁরা বুঝবেন এই উচ্চ প্রতিভাদীপ্ত দেশবরেণ্য নেতা ও বিশ্ববরেণ্য আধ্যাত্মিক প্রবক্তা গীতার মধ্যে কী গভীর তাৎপর্য খেয়াল করেছিলেন।

আলমবাজারে যুবক শিষ্যদের প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে স্বামী বিবেকানন্দ যে উপদেশ-ব্যাখ্যা উত্থাপন করেন তা 'গীতাতত্ত্ব' নাম দিয়ে মুদ্রিত হয়েছে। তার একাংশে আছে— উপনিষদ হল নানা 'অপ্রাসঙ্গিক কথা'-র মাঝখানে 'হঠাৎ এক মহাসত্যের অবতারণা। 'যেন জঙ্গলের মধ্যে অপূর্ব সুন্দর গোলাপ— তাহার শিকড় কাঁটা পাতা সব সমেত।' সেই সঙ্গে 'গীতার মধ্যে এই সত্যগুলি' 'অতি সুন্দরভাবে সাজানো— যেন ফুলের মালা বা সুন্দর ফুলের তোড়া।' ওই আশ্চর্য উপমা খেয়াল করলে মনে পড়ে জোহান গটফিয়েড হার্ডারও ভেবেছিলেন গীতা হলো ভারতের আদি কুসুম— 'Early flowers of India', সভ্যতার আদি। কখনও ভারতই যেন ফুল হয়ে ফুটে উঠেছে গীতায়— 'The Bhagvatgita and Blossoming of India'।

প্রায় একইভাবে ভেবেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। তাঁর মতে মহাভারতে পাওয়া যায় ভারত সভ্যতার সারবস্তু। অন্যপক্ষে গীতা হলো মহাভারতের সার। বস্তুত বাংলা ও ভারত— ভারতের উত্তর দক্ষিণ পূর্ব পশ্চিমের যাবতীয় চিন্তাস্রোত গীতায় মিশেছে। একথা যাঁরা বুঝবেন না তাঁদের উদ্দেশে বিশেষ কিছু লেখার নেই। একটা কথা বলেই শেষ করব— গীতাকে হিন্দু ধর্মগ্রন্থ বলে যাঁরা আপত্তি তুলছেন তাঁরা বোধহয় ভুলে গেছেন 'হিন্দু' শব্দটি ধর্মবাচক নয়— এ হলো দেশবাচক। একাদশ শতাব্দীর কিছু আগে থেকে আরবি ব্যবসায়ী ও সৈন্যরা এদেশে আসতে থাকে। সিন্ধুনদের পূর্বাঞ্চলকে তারা হিন্দুদের আবাস বলত। হিন্দু শব্দটি এরপর থেকে ধীরে ধীরে ভারতীয় শব্দের পরিবর্তে ব্যবহৃত হতে থাকে। গীতা সংকলনের বহু পরে মুসলমান আক্রমণ ঘটেছে। গীতাকে হিন্দু ধর্মগ্রন্থ বলে ভাবাটা তাই ঘোড়ার আগে গাড়ি জুড়ে দেবার মতো ব্যাপার। গীতা ভারত সভ্যতার ব্রহ্মকমলের মতো নিত্য সত্য ও চিরন্তন জীবননীতির মহাভাষ্য। এর সঙ্গে যুক্ত রয়েছে ভারতের জীবন সাধনা, দর্শন, উপলব্ধি, অনুশীলন। জাতীয় গ্রন্থ হিসাবে গীতার দাবি যাঁরা অস্বীকার করবেন তাঁদের দেশ কি ভারতবর্ষ? বিদেশী ভাবাদর্শের অগভীর জড়বাদ দিয়ে গীতাকে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা ক্ষুর দিয়ে মহাবৃক্ষ কেটে ফেলার স্বপ্ন ছাড়া কিছু নয়।

(লেখক গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য)

SHREE NURSING TIMBER & ELECTRIC STORES

Since 1958

Poddar Court, Gate # 4, 2nd Fl., Room # 7 & 8
18 Rabindra Sarani, Kolkata - 700 001
Telefax : 2235 5210, Smart : 2386
Cell : 98300 88272, 98305 44455
E-mail : sntescal@yahoo.com

21 Ashirwad Tower (Near Raj Talkies)
G. E. Road, Raipur - 492 001, Telefax : 0771 2536978
E-mail : sntes@yahoo.com

AUTHORISED DISTRIBUTOR

GLOSTER WIRES & CABLES

HAVELLS

CABLE CORPORATION OF INDIA LTD.

ANISO PLAZA 9002 CO.

DENSONS CABLE JOINTING KITS

LIGHTING

LIGHTING

OSRAM LIGHTING

ASHOCAB

DAS STEEL UDDYOG

Naldubi, Mangalbari, Po.+Dist. : Malda

সকল প্রকার স্টীল ফার্ণিচার,
গ্রীলগেট এবং ফেব্রিকেশনের
কাজ করা হয়

Show Room

—ঃ যোগাযোগের ঠিকানা ঃ—

GEETANJALI FURNITURE

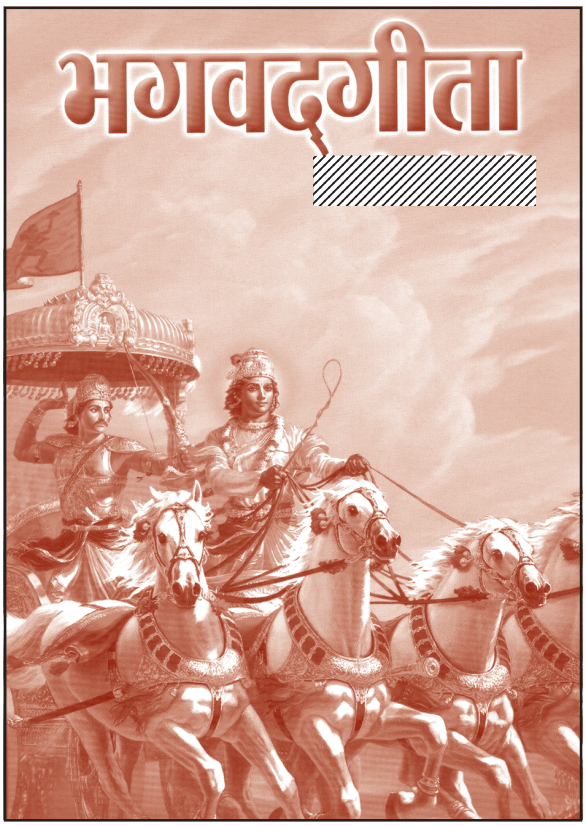
Jhaljhalia, Station Road, Malda

Phone : 03512-266063,

Mobile : 9733387091



Mfg. by : Ringo Foods & Beverages (P) Ltd.



নিত্যজীবনে প্রেরণার পাথেয় গীতা

নবকুমার ভট্টাচার্য

পাশবদ্ধ জীব। পাশমুক্ত শিব। বন্ধনমুক্তির চিরন্তন দোলায়, শিবত্বের (মুক্তির) অভিলাষী মানবাত্মার আত্মজাগরণের নির্ভরযোগ্য সোপান শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতা। আমাদের চেতনার চৈতন্যকে জাগ্রত করার একমাত্র অভিধান। ভারতীয় মনীষার এক আশ্চর্য সৃষ্টি। অবশ্য মহাভারতের কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের সঙ্গে গীতা যুক্ত বলে অনেকে তাকে হিন্দুদের এক ধর্মগ্রন্থ বলে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই গ্রন্থ সবধর্মের সর্বকালের। 'নবধারায় গীতার মর্মবাণী' গ্রন্থে পণ্ডিতপ্রবর ড. গৌরীনাথ শাস্ত্রী এ প্রসঙ্গে বলেছেন, ''শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতা এক অমূল্য সম্পদ। এই লোকোত্তর সাহিত্য সকল যুগের সকল মানুষকে সত্যের সন্ধান দিয়েছে।'' গীতা পৃথিবীর সব দেশের সব মানুষকে দিয়েছে ভূমার সন্ধান। তাই দেশকাল ছাড়িয়ে গীতা হয়ে উঠেছে মানুষের দেবত্ব সত্তায় উত্তীর্ণ হওয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ পাথেয়। এ প্রসঙ্গে স্বামী রঙ্গনাথানন্দ (শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতা রূপরেখা পৃ. ৬) তাই বলেছেন, 'গীতা কোনো ভেদরেখা রাখেনি। ঋষিরা তাঁদের সমুন্নত চিন্তারাশি শুধু যে হিন্দুদের দিয়ে গিয়েছেন তা নয়, জাতি বা সম্প্রদায় নির্বিশেষে সবাইকে তাঁরা উত্তরণের পথ দেখিয়েছেন। এখানে যে ধর্মের শিক্ষা দেওয়া হয়েছে তা মানবধর্ম। এটা মানব সমাজের কোনো খণ্ডিত অংশের জন্য নয়। সৈনিক থেকে নাগরিক গীতার সর্বজনীনতা এক অভ্রান্ত সত্য।' আমাদের জীবন বস্তুটি যে আসলে কী, সেকথা বোঝাবার জন্যে গীতায় রয়েছে অপূর্ব বিশ্লেষণ। মনের অধোগতি ও ঊর্ধ্বগতির পরিপ্রেক্ষিতে এই জীবনের নানা প্রতিচ্ছবিই গীতায় স্বর্ণাক্ষরে প্রতিফলিত হয়েছে। মনকে যদি আত্মার বন্ধু হিসেবে পাওয়া যায় তাহলে আত্মস্বরূপকে সহজেই চেনা যায়। পরিশুদ্ধ মনটি যদি পরমপ্রেরণায় সজ্জিত হয় তখন চেতনার গভীরে চৈতন্যের উদয় হয়। মনকে সুপথে চালিত করে অন্তরের চেতনাকে জাগিয়ে তোলাই হচ্ছে—মানবিক বোধের সঞ্চার। সেই সঞ্চরণ থেকেই সৃষ্টি হয় মনুষ্যত্বের ভাবনা। তাই চেতনার পরিপূর্ণ উন্মেষেই হয় মহাচৈতন্যের জাগরণ। গীতার শ্লোকে রয়েছে ত্রিগুণাত্মিকা শক্তির (মায়া) দ্বারা পরিচালিত প্রতিদিনের মনুষ্যজীবন কী ভয়াবহভাবে বন্ধন দশায় আক্রান্ত। রবীন্দ্রনাথের কথায়—

'জানি না তো কোন্ কালো এই ছায়া
আপন ব'লে ভুলায় যখন ঘনায় বিষম মায়া।
স্বপ্নভারে জমল বোঝা, চিরজীবন শূন্য খোঁজা—
যে মোর আলো লুকিয়ে আছে রাতের পারে
আমায় দেখতে দাও।'

অবশ্য মায়া প্রভাবিত দুঃসহ বেদনাবহ জীবনকে আবার শুধু সুন্দর আনন্দময় করে তোলার সন্ধান মেলে গীতার প্রতিটি ছত্রে। মানবজন্মের শ্রেষ্ঠ সংহিতাই হচ্ছে গীতা। জীবনের প্রত্যেকটি মুহূর্তের অনুভূতি এবং সংহতির স্বরূপ ব্যাখ্যাই এই মহাগ্রন্থ। মানুষের জীবনের শুদ্ধ উত্তরণই তাঁর প্রধান কর্তব্য। সেই কর্তব্যকেই স্পষ্ট ব্যাখ্যা করা হয়েছে এই গ্রন্থে। স্বামী বিবেকানন্দের মতে, মানুষের জীবনটাই একটা কুরুক্ষেত্র, সেখানে প্রত্যেকেই অর্জুন। প্রতিক্ষণেই সেক্ষেত্রে সংগ্রাম করতে হয় অন্যায়ের সঙ্গে, পথভ্রষ্ট আত্মীয় বন্ধু— এমনকী নিজের সঙ্গেও। অনেক সময় নেমে আসে ক্লান্তি, নৈরাশ্য ও দুর্বলতা। তখন গাণ্ডীব নামিয়ে রাখতে ইচ্ছে করে। আর সেই সময় অন্তরাত্মা বলে ওঠে— 'ক্লৈব্যংমাস্ম গমঃ পার্থ'— তোমাকে এটা সাজে না— 'নৈতৎ ত্বয্যুপপদ্যতে'। আবার আমরা উঠে দাঁড়াই, তীরবিদ্ধ করি অন্তর ও বাইরের শত্রুকে। তাঁর ভাষায়— 'For all of us in the world, life is a continuous fight'। স্বামীজী দিয়েছেন 'অভীঃ' মন্ত্র— সব দুর্বলতাকে ত্যাগ করে বীরের মতো সংগ্রাম করার উদ্দাম প্রেরণা। এর মূলে রয়েছে গীতা।

গীতা সর্বশাস্ত্রময়ী। অন্য শাস্ত্র না পড়েও গীতা পড়লেই তাদের সারাৎসার পাওয়া যায়। এমনকী সাংখ্য, যোগ ও বৌদ্ধমতাবাদের খোঁজও এর মধ্যে মেলে। R. L. Zachner তাঁর গীতার ভূমিকায়, Hindu scriptures-এর ভূমিকায়, Hinduism গ্রন্থে গীতার তিনটি পৃথকস্তর লক্ষ্য করেছেন। প্রথম থেকে ষষ্ঠ অধ্যায়ে বিভিন্ন উপায়ে মুক্তির পথ বর্ণনা করা হয়েছে। তৃতীয় থেকে পঞ্চম অধ্যায়ে কর্মের তত্ত্ব। কর্মতত্ত্ব অতি গুরুত্বপূর্ণ। কারণ কুরুক্ষেত্রের প্রেক্ষাপটে অর্জুন কর্মবিমুখ হয়ে গাণ্ডীব ত্যাগ করেছেন। তাঁকে যুদ্ধে প্রবৃত্ত করতে হলে কৃষ্ণকে কর্মের প্রকৃতি, ফল, অনির্বাযতা, কর্মবন্ধন মোচনের উপায়

ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করতেই হবে। সবচেয়ে বড় তত্ত্ব হলো— কৃষ্ণে কর্মফল ত্যাগ। ষষ্ঠ অধ্যায়ে ধ্যান ও যোগ। সপ্তম থেকে ব্যক্তিগত ঈশ্বরের স্বভাব বিশ্লেষণ শুরু এবং তার অপূর্ব কবিত্বময় উপসংহার একাদশ অধ্যায়ে বিশ্বরূপদর্শন। দ্বাদশ অধ্যায়ে ভক্তি ছাড়াও একটা নতুন কথা রয়েছে— মানুষের প্রতি ঈশ্বরের ভালবাসা। ভক্তির বদলে প্রীতি এবং তা সর্বব্যাপী। ত্রয়োদশ অধ্যায়ে সাংখ্যের নানা তত্ত্ব আলোচিত। চতুর্দশ থেকে অষ্টাদশ অধ্যায় পর্যন্ত প্রকৃতির তিন গুণের নানা আলোচনা। ঋষি অরবিন্দ মনে করতেন গীতার মধ্যে রয়েছে উদারতা। তাকে ভিত্তি করেই আমরা দেবত্বের দিকে এগোতে পারি। গীতায় অদ্বৈতবাদের কথা রয়েছে, তাকেই প্রাধান্য দিয়েছেন শঙ্করাচার্য। গীতায় দ্বৈতবাদ ও বিশিষ্ট দ্বৈতবাদের কথাও রয়েছে। সব মিলিয়ে গীতা মানবধর্মের শ্রেষ্ঠ গাথা। গীতা আমাদের শিখিয়েছে সুখ দুঃখকে অতিক্রম করার মন্ত্র। মন হবে পবিত্র এবং অনমনীয়। স্থিতধী পুরুষ হলে তিনি দুঃখে অবিচল থাকবেন। সুখে নিস্পৃহ ব্যক্তিকে হতে হবে এমন মানুষ যিনি সবকিছুর ওপর মোহ ত্যাগ করেছেন। সবচেয়ে বড় কথা, সব কাজ করতে হবে নিরাসক্ত হয়ে। ফলের আশা না করেই কর্তব্য পালনের তত্ত্বও রয়েছে গীতায়। শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন— এই ঘরবাড়ি পরিজন সব ঈশ্বরের। আবার গীতায় রয়েছে— 'ঈশ্বরের প্রীতির জন্য আমি কাজ করছি'। এই ভাবকে গ্রহণ করতে পারলে তবেই কর্মফলের আশা না করে কর্ম করা যায়, ত্যাগী হওয়া যায়। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের উদার নির্দেশ যে, মানুষ তোমরা সব কাজকর্ম কর, তোমাদের সংসার ত্যাগ নয়। তোমাদের মনে মনে সংসার ত্যাগ করতে হবে। শুধুমাত্র বিষয় চিন্তার পরিণাম বুদ্ধির বিনাশ। বিষয়ে আসক্ত লোকের প্রকৃত সুখ কোথায়? নিরাসক্ত কর্তব্যবোধই গীতার শ্রেষ্ঠ শিক্ষা। নিষ্কাম কর্মযোগই গীতার সবচেয়ে বড় কথা। রবীন্দ্রনাথের কথায়—

'বাসনা যখন বিপুল ধুলায়
অন্ধ করিয়া অবোধে ভুলায়
ওহে পবিত্র, ওহে অনিদ্র, রুদ্র আলোকে এসো।'

মানবজীবনের শ্রেষ্ঠ কাম্য যে পথ, সে পথ কামিনী কাঞ্চনের বহু ঊর্ধ্বে। যা আনন্দে, সৌকর্যে, পরিশুদ্ধতায় চেতনার গভীরে পরমপ্রেমের ঝঙ্কার তোলে এবং তখন পরমার্থের বোধও বিকশিত হয়ে ওঠে। তখনই এ জীবন চায় তার ঈশ্বরের প্রেমময় সত্তার সন্ধান। কামনা-বাসনা প্রতিহত হলে তবেই নিষ্কাম মানসিকতার সেই পরম জ্ঞানের দ্বার খুলে যায়। ভান বা প্রতারণার মানসিকতাকে বর্জন করে। সদাচারী হয়ে সত্যের অনুধ্যানই যথার্থ জীবনচর্চা। যিনি সবরকম কামনা-বাসনা পরিত্যাগ করে মায়াবন্ধন হতে মুক্ত হয়ে অহংত্যাগ করে নিরহঙ্কার এবং অনাসক্তভাবে বিচরণ করেন, তিনিই সমস্ত সংসার দুঃখের নিবৃত্তি ঘটিয়ে পরমশান্তি লাভ করেন। বিশ্বের এই একটি মাত্র গ্রন্থ যেখানে সুখ এবং শান্তি লাভের উপায় সম্বন্ধে পথ দেখানো হয়েছে। এই কথাগুলো আমাদের দেশের অধিকাংশ নেতাই শোনেননি, কারণ গীতার সন্ধান তাঁরা রাখেন না। তাই গীতা সম্বন্ধে তাঁদের বিরূপ মনোভাব। আমাদের দেশের মূল আদর্শ হলো ত্যাগ।

উপনিষদের বাণীও তাই। ত্যাগেই শান্তি। ঠাকুর রামকৃষ্ণ বলেছেন— 'গীতার অর্থ কি? দশবার বললে যা হয়। 'গীতা' 'গীতা' দশবার বললে 'ত্যাগী' হয়ে যায়।' আর নেতারা মলমূত্র ছাড়া কিছুই ত্যাগ করেন না। তাই জাতীয়গ্রন্থ হিসেবে গীতার স্বীকৃতি তাঁদের কাছে অস্বস্তিস্বরূপ। ধর্মনিরপেক্ষতার অর্থ ভারতবাসী তার প্রেরণার পাথেয়কে স্বীকৃতি জানাতে পারবে না। কারণ ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রে জাতীয় গ্রন্থ থাকতে নেই। আমরা কি তাহলে বিশ্বে ভুঁইফোড় হিসেবে থেকে যেতে চাইছি?

স্বাধীনতা আন্দোলনে গীতা প্রেরণা স্বরূপ কাজ করেছিল। আর ছিল 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনি। 'বন্দেমাতরম্'কে ত্যাগ করেছি এবং গীতাকেও ত্যাগ করতে চলেছি। এই রকম নেমকহারাম জাতি বিশ্বে আর কোথাও আছে কি? ধর্মনিরপেক্ষতার অর্থ তাহলে দেশের প্রতি নেমকহারামি বলা চলে। জাতীয় জীবনের বর্তমান দুর্গতির মূল কারণ এটাই। গীতার লক্ষ্য ধর্মসমন্বয়। কিন্তু আমাদের দেশের নেতারা ধর্ম নিয়ে দেশভাগ করে এখন গীতাকে জাতীয়গ্রন্থ হিসেবে স্বীকৃতি দিতে কুণ্ঠিত। গীতা সম্পর্কে মহাত্মা গান্ধীই বলেছেন, 'যখন সন্দেহ আমাকে ঘিরে ধরে, হতাশা সম্মুখে উপস্থিত হয়। আর আমি দূরান্তে কোনো আশার আলো দেখতে পাই না তখন ভগবদ্গীতা আশ্রয় করে শান্তি পাওয়ার মতো কোনো শ্লোক খুঁজে পাই। সঙ্গে সঙ্গে আমি অত্যন্ত দুঃখের মধ্যেও হাসতে আরম্ভ করি।'

এখন প্রশ্ন, যদি মাত্র এই গ্রন্থ পড়ে আমরা সবাই আনন্দলাভ করতে পারি হতাশামুক্ত হতে পারি, সর্বোপরি সুখী হতে পারি, তবে সেই গ্রন্থকে জাতীয় গ্রন্থ করা হলে আপত্তি কেন? গীতাই তো ব্যক্তিকে উত্তরণের মন্ত্র দিয়েছে, জানিয়েছে দেবত্বের পথ, শিখিয়েছে শরণাগতি। যদি প্রত্যেক ব্যক্তির মধ্যে দেবত্বের রূপ জাগে, তাহলেই তো গড়ে ওঠে একটা সুখী ও সমৃদ্ধ সমাজ। গীতা সেই সমাজ গঠনেরও পথ দেখিয়াছে। এখন সুধী ও সমৃদ্ধ সমাজ গড়ে উঠলে জাতপাত সংখ্যালঘুভিত্তিক দলগুলি অসুবিধায় পড়বে। তাদের ভোটব্যাঙ্ক ধ্বংস হয়ে যাবে। তাই গীতার বিরোধিতা। কিন্তু গীতার আদর্শ হলো সর্বসাধারণের জন্য সর্বাধিক সুখ। সবাইকে নিয়েই গীতা এবং সবার জন্যই তার ভাবনা। কারণ ঈশ্বর আছেন সর্বভূতে— ঈশ্বর সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি' (১৮।৬১)।

এখানে জাতপাত ধর্ম নেই। তাই সবাইকে দেখতে হবে নিজের মতো করে— সর্বত্র সমবস্থিতমীশ্বরম্ (১৩।২৮)। গীতায় রয়েছে সহাবস্থান, সহমর্মিতা ও পারস্পরিক শ্রদ্ধার বাণী— 'পরস্পরং ভাবয়ন্তঃ শ্রেয়ঃ পরমবাপ্স্যথ (৩।১১)'— স্বার্থপরতা, শোষণ বা নিপীড়নের স্থান গীতায় নেই।

কিছু স্বার্থপর কুটিল ক্ষমতালোভী মানুষ তথাকথিত আধুনিকতার নামে, ধর্মনিরপেক্ষতার নামে, রাজনীতির নামে পশুত্ব থেকে মানবত্বে উন্নীত হওয়ার একমাত্র সোপান শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতাকে অপমানে কুণ্ঠিত নন। গীতা আজও জীবন্ত, যা গৃহস্থ ও সন্ন্যাসী উভয়ের পথ চলার সাথী— দেশের সর্বোচ্চ আদালতও যাকে ন্যায় ও পবিত্রতার আসনে বসিয়ে এখনও শ্রদ্ধা জানায়। একমাত্র গীতার মাধ্যমেই মানুষ খুঁজে নিতে পারে অন্তরের দেবত্বকে। ■

হিন্দুত্ব বিশ্বকে ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ করে

ড. স্বরূপ প্রসাদ ঘোষ

হিন্দুত্বের ভাব সকল মানুষকে আত্মীয়ের আভিজাত্যে আবদ্ধ করে। সংসারের বৈচিত্র্যময় নিয়মকানুনের আঁকাবাঁকা পথে চলতে গিয়ে আমরা অনেক সময়ই সমাজ ও সংসারের সঙ্গে ধর্মের সহজ সম্পর্কটি রাজনৈতিক কারণে জটিল করে ফেলি। আমাদের চৈতন্য যদি সত্যই জাগরিত থাকত তাহলে আমরা অনুভব করতাম যে হিন্দুত্বের ভাব শুধু ভারতবর্ষের প্রেক্ষাপটেই সীমাবদ্ধ নয়, সমগ্র বিশ্বের শুভ শক্তির জাগরণের জন্যই ঋষিরা প্রার্থনা জানিয়েছিলেন। হিন্দুত্ব বলতে স্বধর্মে স্থিতি, সনাতন ধর্মে প্রীতি ও সর্বধর্মে সম্প্রীতি বোঝায়। যদি কেউ ধর্মনিরপেক্ষতাকে বর্ম করে নিরীশ্বরবাদকে জোর দেন তিনি হিন্দুত্বকে নিয়ে অকারণে চঞ্চল হয়ে ওঠেন। বেদ-ধর্ম আমাদের হৃদয় আসনে পরমতসহিষ্ণুতার আদর্শকে সঞ্জীবিত করে। কিন্তু ধর্মনিরপেক্ষতা শুধু ভারতবর্ষেই অনুশীলিত হলে সভ্যতা রক্ষা পাবে না। সমগ্র মানবজাতিকেই পরমতসহিষ্ণু হতে হবে। বিশ্বের অন্যান্য দেশের সংবিধানেও ধর্মনিরপেক্ষতার যথাযোগ্য স্বীকৃতি জরুরি। ভারতের প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলি থেকে সমগ্র মধ্যপ্রাচ্য ও পশ্চিম এশিয়ায় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উপর কিরূপ বর্বর অত্যাচার হচ্ছে ও সাম্প্রদায়িক চাপে ধর্ম পরিবর্তনে বাধ্য করা হচ্ছে তা সকলের জানা।

হিন্দুত্বে পরমতসহিষ্ণুতার দর্শন আছে বলেই ভারতবর্ষের সংখ্যালঘু জনসংখ্যা বাড়ছে। এই ঐতিহ্য পশ্চিম এশিয় দেশগুলি বা মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলিতে গৃহীত হলে বিশ্ব রাজনীতির চালচিত্রই বদলে যাবে। তা না হলে উদারপন্থী মানবতাবাদের সঙ্গে সংকীর্ণতার দোষে দুষ্ট সম্প্রদায়গত ভাবনাকে এড়িয়ে চলা দুষ্কর। নিজ ধর্মকে জোর করে অন্যের উপর ছলে-বলে-কৌশলে চাপিয়ে দেওয়ার ভাবই প্রকৃত ধার্মিক ভাব নয়। বিশ্বের প্রেক্ষাপটে প্রাচীন ধর্মগুলি কখনই তা করেনি। পরবর্তীকালে ধর্মে এই ভাবের উদয় হয় সেমেটিক ধর্মগুলির মাধ্যমে। আর্য ধর্মসংস্কৃতির শুদ্ধ স্রোত মানুষকে স্থিতধী করে, সাত্ত্বিক ভাবের উদয় ঘটায়। ব্রহ্মজ্ঞানের দীপ্তিতে চেতনা উদ্ভাসিত করে, সর্বভূতে ঈশ্বরের উপলব্ধির মাধ্যমে যে শাশ্বত সনাতন সত্যে উত্তীর্ণ হয়ে, সকলের সঙ্গে মিলন হতে পারে তা হিন্দুত্বের শিক্ষার প্রাণকেন্দ্রে। বসুন্ধরা তাঁর কাছে মহামিলন তীর্থরূপ যা 'বহুজন হিতায় বহুজন সুখায়' এই ভাবকে মূলধন করে নতুন বিশ্ববিবেক হিন্দু-বৌদ্ধ ঐক্যের মধ্য দিয়ে জাগরিত হোক গৈরিক পতাকাতলে। আর্য-ধর্ম সংস্কৃতির নবজাগরণ ঘটুক। খৃস্টধর্মও অহিংসাকে দর্শনগতভাবে স্বীকার করে। তাই 'কৃষ্ণ-বুদ্ধ-খৃস্টে'র অহিংস ভাব বলয় অশান্ত মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে পারে সত্য, আনন্দ ও শান্তির বার্তা।

হিন্দুত্বের ধ্যানে রয়েছে উপলব্ধির চেতনা যেখানে স্বার্থবুদ্ধিহীন মানুষের মহামিলন তীর্থ। লোভে হিন্দুত্বের সঙ্গে যুক্ত হওয়া যায় না, ত্যাগের বাণী হৃদয়ে না থাকলে এই সনাতন ভাবকে বোঝাও সম্ভব নয়। যে ভাব আত্মার আনন্দ আনে, মনে শান্তির ভাব জাগরিত করে ও নয়নকে অশ্রুস্নাত করে দেয়, সেই প্রেমানন্দে যাঁর সতত বাস সেই মঙ্গলময়কে বিতর্কের পঙ্কে নামিয়ে আনা শুধু ধর্মনিরপেক্ষবাদের নামে যাঁরা স্বার্থযুক্ত নিরীশ্বরবাদের চয়ন করেন তাঁদের পক্ষেই সম্ভব। নিশীথের আঁধারের মধ্যে হিন্দুত্বের ভাব জাগরিত হলে আত্মা সেই আনন্দলোকের ধ্রুবজ্যোতির সন্ধান পায়, তবেই আমরা পরস্পরের প্রকৃত হিতাকাঙ্ক্ষী হয়ে উঠতে পারি। সেখানে পাপ ও পুণ্য, আনন্দ ও দুঃখ একাকার হয়ে যায়। তখন ধর্ম আর তর্কের বিষয় থাকে না। অনুভব ও উপলব্ধির বিষয় হয়— সেই সময়ই হৃদয় মন্দিরে প্রকৃত জ্ঞানের স্পর্শ পাওয়া যায়। যতক্ষণ না আমাদের সমাজ সত্যের সঙ্গে এই ভাব অনুভব করতে পারবে ততক্ষণ হিন্দুত্বের সঙ্গে ছদ্ম- ধর্মনিরপেক্ষতায় বিশ্বাসী রাজনৈতিক মানুষজন মিলতে পারবে না। আর যতক্ষণ আমরা সহজ সত্যটি জটিল তর্কে গুলিয়ে দেবার জন্য চেষ্টায় রত থাকব তখন তার পূর্ণ সুযোগ নেবে।

সমগ্র বিশ্ববাসীকে ভ্রাতৃভাবে, মৈত্রীবন্ধনে আবদ্ধ করতে রাষ্ট্রবোধের সঙ্গে বিশ্ব কল্যাণকে মেলাতে হিন্দুত্ব নেমেছে স্বচ্ছতাকে সামনে এনে, গীতাকে মনেতে মেনে, বন্দেমাতরমে বিশ্বাস রেখে, স্বামী বিবেকানন্দের মন্ত্রে দীক্ষা নিয়ে, গৈরিক বস্ত্র সম্বল করে, সনাতন হিন্দুধর্মকে রক্ষার ব্রতদৃঢ় প্রতিজ্ঞা পালনে মহাওঙ্কার ধ্বনিকে আহ্বান করছে সে সগৌরবে।

হিন্দুত্বের আদর্শ উপনিষদের চৈতন্যে বিকশিত গীতার ভাবে স্নাত ভারতবর্ষের সাধনায় আত্মমগ্ন। ভারতবর্ষের তপোবনের সভ্যতার ঊষালগ্নে উপনিষদের ঋষিকণ্ঠে উচ্চারিত মন্ত্র 'ঈশ্বাস্য মিদং সর্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ, তেন ভক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্যসিদ্ধনম্'-এর

ভাব অনুভব করে হিন্দুত্ব ঘর গোছাতে নেমেছে। পরকে আপন করে, অহঙ্কারকে খর্ব করে বিরোধের হলাহলকে দূরে সরিয়ে, হাজার বছরের বর্বর অত্যাচারকে ক্ষমা করে, প্রেম ও ভালোবাসার পথকে প্রশস্ত করতে সমগ্র বিশ্ববাসীকে ভ্রাতৃভাবে, মৈত্রীবন্ধনে আবদ্ধ করতে রাষ্ট্রবোধের সঙ্গে বিশ্ব কল্যাণকে মেলাতে হিন্দুত্ব নেমেছে স্বচ্ছতাকে সামনে এনে, গীতাকে মনেতে মেনে, বন্দেমাতরমে বিশ্বাস রেখে, স্বামী বিবেকানন্দের মন্ত্রে দীক্ষা নিয়ে, গৈরিক বস্ত্র সম্বল করে, সনাতন হিন্দুধর্মকে রক্ষার ব্রতদৃঢ় প্রতিজ্ঞা পালনে মহাওঙ্কার ধ্বনিকে আহ্বান করছে সে সগৌরবে।

সনাতন ভারতবর্ষে আধ্যাত্মিক সাধনা ও বিদ্যাচর্চা উভয়েই যথেষ্ট গুরুত্ব পেত। তপোবনের ঋষি-মুনি ও আচার্যরা দেশ ও জাতির উন্নতির ভিত্তি হিসাবে চরিত্র গঠনকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিতেন। আমাদের সাধনায় রাজযোগের বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। যোগের সার্থকতা ব্যক্তিজীবনে পবিত্রতা রক্ষার মধ্য দিয়েই সাধিত হয় এবং হিন্দুত্ব এই সাধু অনুশাসন আয়ত্ত করতে শোখায়। হিন্দুধর্মের ভাবে জীবন গঠন করলে সেই পবিত্রতাকে রক্ষা করা সম্ভব হবে। উদাহরণস্বরূপ, পরশ্রীকাতরতা আমাদের বাঙালি সমাজে প্রবলভাবে বিরাজমান এবং এর প্রভাব সম্পর্কে আমরা সকলেই সচেতন। শিক্ষা যদি আমাদের এ সকল থেকে মুক্তই করতে না পারল ও আমাদের চরিত্রগঠনের সহায়কই না হলো তা হলে শিক্ষার উদ্দেশ্যই অপূর্ণ থেকে গেল। আদর্শ জীবনযাপনের কথা মুখে স্বীকার করলেও কার্যক্ষেত্রে এ সম্পর্কে আমরা উদাসীনতাই প্রদর্শন করি। গীতাকে মূল শিক্ষার সঙ্গে যুক্ত করলে আমরা এই দীনতা থেকে মুক্ত হতে পারি। স্বার্থযুক্ত মন গঠনের পিছনে আছে ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার রীতিনীতি যা ব্যক্তিকেন্দ্রিকতাকে প্রশ্রয় দেয়। বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় স্বার্থপরতার কুপ্রভাব প্রবল হয়ে উঠেছে যা একজন ব্যক্তির সামাজিক দায়িত্ববোধকে প্রায় নিঃশেষ করে দিয়েছে। তাই নির্দ্বিধায় আমরা ভাবতে পারি যে ত্যাগের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে আমাদের প্রতিবেশীর সন্তানটি জীবন উৎসর্গ করুক। অপরদিকে আমার ঘরের সন্তান একটা চাকরি নিয়ে সুখে জীবনযাপন করুক। ফলে শিক্ষাকে আমরা কতটা জীবনগঠনের কাজে প্রতিফলিত করতে পারলাম সেদিকে আমাদের দৃষ্টি থাকে কম।

সত্যের সাধনা ও নির্লোভ জীবনচর্যার দর্শন হিন্দু শাস্ত্রবিধানের মধ্যে রয়েছে— 'অর্থমনর্থং ভাবয় নিত্যং নাস্তি ততঃ সুখলেশঃ সত্যম্।' তবে কি শিক্ষার অর্থকরী গুরুত্ব অস্বীকার করব? তা নয়। কিন্তু জীবনগঠনের আদর্শের সঙ্গে জীবনধারণের প্রয়োজন সাধনের সুন্দর সমন্বয় দরকার, যাতে ভালো চাকরির সঙ্গে সঙ্গে একজন বিদ্যার্থী সুভদ্র নাগরিক ও সুস্থ নির্লোভ কর্মী হয়ে সামাজিক দায়িত্ববোধ পালনে সচেষ্ট হয়। তাই সন্তানের জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এসে বুঝতে হবে কি কারণে পড়াশুনা? শুধুই নামী কোম্পানিতে দামি চাকরির জন্য, নাকি প্রকৃত মানুষ হবার তাগিদ থেকে পড়াশুনা করা? শিক্ষার বিষয়বস্তুর মধ্যে গীতাকে রাখলে তা মানুষ হিসাবে বড় হবার পথে অনেকটা সাহায্য করবে।

অতিরিক্ত অর্থচিন্তা যে মানুষকে সুখ ও সভ্য উভয় থেকে দূরে টেনে নিয়ে যায় সে কথা আমরা জানলেও বোধহয় বিশ্বাস করি না। যার জন্য আজকাল একশ্রেণীর পিতামাতা পুত্রের চাকরি হবার কিছুদিন পরই বিভিন্ন মানসিক কারণে কাতর হয়ে পড়েন। বিভিন্ন সময় বিদ্যার্থীদের পিতামাতার সঙ্গে আলাপ আলোচনার সময় দেখেছি যে তাঁরা আপেক্ষ করে বলেন, তাঁদের সন্তান তাঁদের অসম্মান করে, অবজ্ঞার সুরে কথা বলে। এর কারণ হলো যদি গৃহের গুরুজনরা তার সামনে জীবনের কোনো আদর্শ না রাখতে পারেন, যদি তাঁরা গৃহে এমন জীবনযাপনের সঙ্গে যুক্ত থাকেন যা নীতিবোধশূন্য তাহলে সন্তানের কাছে সম্মান আশা করতে পারেন কি? সন্তান বড় মাইনের চাকরি করলেই যাঁরা সন্তুষ্ট হন তাঁরা নিজ সন্তানের মধ্যে আদর্শবোধের সঞ্চার ঘটাতে কতটুকু সক্ষম হয়েছেন তা ভেবে দেখেছেন কি? কথায় আছে যেমন কর্ম তেমন ফল। আমরা যদি মনে করি জাতিগঠন নিয়ে ব্যস্ত থাকা রাষ্ট্রনেতাদের কাজ, তাই আমার সন্তান সে ব্যাপারে উদাসীন থাকুক ও কায়মনোবাক্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে গিয়ে সুখে শান্তিতে থাকার চেষ্টায় ব্রতী হোক তবে সেই চিন্তার মধ্যে যে স্বার্থপরতা আছে তা থেকে সন্তানকে মুক্ত করব কীভাবে? জগৎটা তার কাছেও ছোট হয়ে আসবে, সেও স্ত্রী-সন্তানের পরিধিটুকুর মধ্যেই বাঁধা পড়ে যাবে। বৃদ্ধ বয়সে আমাদের ঠাঁই হবে বৃদ্ধাশ্রমে। তখন আমাদের ক্রন্দনও সন্তানের মধ্যে চৈতন্যের জাগরণ ঘটাতে পারবে না। হিন্দুধর্ম বড় করে ভাবতে শেখায়। সাত্ত্বিক জীবন ও উদার মনের শিক্ষা রয়েছে গীতায় ও হিন্দু সাধনায়।

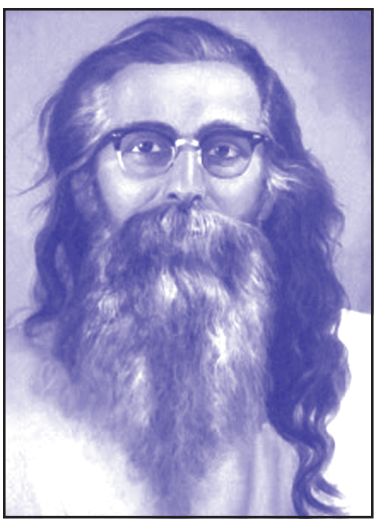
পুরাতন নেহরুবাদী তোষণ তুষ্ট করার নীতি থেকে উদার ও সহনশীল হিন্দুত্ব যুগের নতুন সূচনালগ্নে চির সনাতনের পদধ্বনি শুনছি। গীতার উদ্ঘোষের মধ্যে এক গৈরিক আকর্ষণ অনুভব করছি। আমাদের সংসার ব্রহ্মের দ্বারা পরিচালিত এই ভাব নিয়ে যদি চলি তাহলে সঙ্কীর্ণতা কেটে যাবে। আমাদের ধর্ম অন্তরের মধ্যে অন্তরতরকে সন্ধান করেছে। চৈতন্যের রথে সারথি হওয়ার জন্যে সেখানে বাইরের স্বার্থদ্বন্দ্ব কোলাহলে অন্তর কলুষিত হয়নি, বহির্জগতের বৈরিতা হৃদিমন্দিরকে প্রভাবিত করেনি। প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের আনুষ্ঠানিক ভিন্নতা মানুষের মূল্যবোধের ভিত্তি যে অনন্ত প্রেমপূর্ণ একাত্মতা সেই ভাবকে গ্রাস করেনি, বাইরের গতি অন্তরের স্থিতিকে অখণ্ড ব্রহ্মের সন্ধানে যাত্রায় বাধা সৃষ্টি করেনি। ওই অনুভব নিয়েই হিন্দুত্বের দীর্ঘ যাত্রা প্রাচীনকাল থেকে চলে আসছে। এক হাজার বছরের বর্বর অত্যাচার অতিক্রম করে আবার বিশ্বকে আপন করে নেবার পথে এগিয়ে চলেছে হিন্দুত্ব। আমাদের ঘরে ফেরার ফলে পরকেও আপন করে নেওয়া সহজ হবে। ভারত তার চিরসনাতন রীতিতে প্রত্যাবর্তনের মধ্যে দিয়ে যেমন হিন্দুত্বেই আস্থা স্থাপন করবে তেমনভাবে বিশ্বকে শান্তি ও সম্প্রীতির বার্তা দেবে। কারণ হিন্দুত্বই শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান শেখায়, মনকে অভিমান মুক্ত করে, ত্যাগে অনুপ্রাণিত করে, ভাবে ভগবানকে উপলব্ধি করে, ক্ষমা ও সেবার আলোকে অন্তরকে জাগরিত করে মহাওঙ্কারের আদর্শের সঙ্গে যুক্ত হয়ে হিন্দুত্ব মানুষকে আলোকিত করে।

(রেজিস্টার অফ টেকনো ইন্ডিয়া কলেজ অব টেকনোলজি)

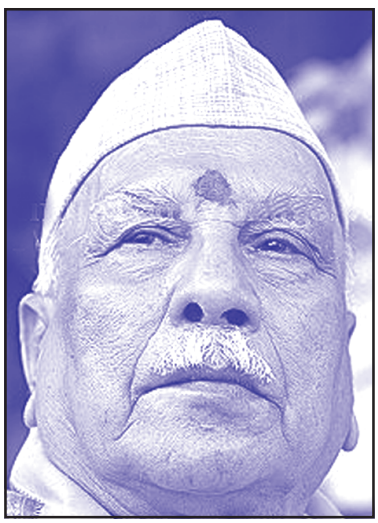
বিশ্ব হিন্দু পরিষদের মার্গদর্শক মণ্ডলী

রোহিণী প্রসাদ প্রামাণিক

বিশ্ব হিন্দু পরিষদের ৫০তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে মহাসমারোহে পালিত হচ্ছে সুবর্ণজয়ন্তী উৎসব। বিশ্ব হিন্দু পরিষদ সূচনার মূল চিন্তন-বিন্দুতে যিনি ছিলেন তাঁর সম্পর্কে বহু জ্ঞানীগুণীজনের মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য। তিনি ছিলেন পূজ্যশঙ্করাচার্যের পদগরিমা ভূষিত করবার মতো যোগ্যতম এক ব্যক্তিত্ব। অধুনা গীতমালাতে যাঁর সম্পর্কে গীত হয় ''দুঃখ সুখ নিন্দা প্রশংসা আপকো সব এক হী থে, দিব্য গীতা জ্ঞান সে যুত, আপকো স্থিতপ্রজ্ঞ হী থে'' (গীতাতে বর্ণিত সুখ দুঃখ, নিন্দা প্রশংসা ইত্যাদি সব কিছুতেই



শ্রীগুরুজী



ওঙ্কার ভাবে

যিনি অবিচল থাকতেন এরূপ স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তি) তিনি হচ্ছেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের দ্বিতীয় সরসঙ্ঘচালক পূজনীয় শ্রীগুরুজী। তাঁর সেদিনের সেই ফলদায়ী ওজস্বীচিন্তনের বীজ আজ পঞ্চাশ বছর পরে এক বিশাল বটবৃক্ষের রূপ ধারণ করে সর্বত্র বিরাজিত।

সনাতন হিন্দু ভাবধারার মত-পথ নির্বিশেষে সমস্ত সম্প্রদায়ের সন্ত মহাত্মাকে দেশধর্ম ও সমাজকে পথ প্রদর্শন করবার গুরুদায়িত্বটি পূজনীয় শ্রীগুরুজী অতি বিনয়ের সঙ্গে নতমস্তকে প্রদান করেন। তৈরি হয় 'মার্গদর্শক মণ্ডলী'। এই মণ্ডলীর মাধ্যমে পরিষদ গঙ্গা, যমুনা, সরস্বতী ত্রিবেণী সঙ্গমের মতো সেবা, সংগঠন ও আন্দোলনের মাধ্যমে সর্বত্র রাষ্ট্রজাগরণের কাজ করে চলেছে। সেবা, সংগঠন ও আন্দোলনে সমাজ জাগরণের যে কোনো কর্মসূচিতে সন্ত মহাত্মাদের অনুমোদন এবং সক্রিয় যোগদান সমাজের সামনে বার বার অগ্রদূতের ভূমিকা পালন করে আসছে।

শৈব, শাক্ত, বৈষ্ণব, জৈন, শিখ, বৌদ্ধ-সহ সমস্ত মত-পথের সন্ত সমাজ অংশ, অর্ধ অথবা পূর্ণকুম্ভে (নাসিক, উজ্জয়িনী, হরিদ্বার ও প্রয়াগ) মাসাধিককাল ধরে উপস্থিত থাকেন। অযোধ্যায় স্বর্গীয় মোহান্ত রামচন্দ্র পরমহংস, স্বর্গীয় বামদেবজী মহারাজ, অযোধ্যার মোহান্ত নিত্যগোপাল দাস, উজ্জয়িনী জ্যোতিঃপীঠের শঙ্করাচার্য বাসুদেবানন্দ, হরিদ্বারের মহামণ্ডলেশ্বর সত্যমিত্রানন্দগিরি, স্বামী চিন্ময়ানন্দ, মহামণ্ডলেশ্বর বিষ্ণুপুরীজী মহারাজ, মোহান্ত অবৈদ্যনাথ, উদিপির বিশ্বেশতীর্থ মহারাজ, শ্রীমদ্ দেবানন্দ ব্রহ্মচারী প্রমুখ সন্ত নেতৃত্ব-সহ হাজার হাজার সাধুসন্তকে নিয়ে কুম্ভে তিন দিনের অধিবেশন বসে 'ধর্মসংসদ' নামে। এই ধর্মসংসদে আগামীদিনের রাষ্ট্র তথা সমাজ জাগরণের করণীয় কর্তব্যের রূপরেখা তৈরি হয়।

অদ্যাবধি পূজ্য সন্তমহাত্মাদের নির্দেশ তথা চিন্তনের পরিণাম হিসাবে সেবা, সংগঠন ও আন্দোলনের সমস্ত কর্মসূচি সফলতার সঙ্গে পালিত হচ্ছে। তাঁদেরই পথনির্দেশ নিয়ে পরিষদের হাজার হাজার কার্যকর্তা (নারী-পুরুষ) লক্ষাধিক স্থানে শহরে, গ্রামে, বনে-জঙ্গলে, মরুভূমিতে সমিতি, সৎসঙ্গ, হিতচিন্তকের মাধ্যমে সংগঠনের কাজে রত আছেন। শিক্ষা, সংস্কার, স্বাবলম্বনকে কেন্দ্র করে আক্ষরিক অর্থে লক্ষাধিক স্থানে চলছে চিকিৎসা সেবা প্রকল্পের কাজ। সর্বত্র পূজ্য সন্তমহাত্মার বিশেষ আশীর্বাদ ও অংশগ্রহণ নজরে আসে। আন্দোলন তথা জাগরণের ক্ষেত্রে— পাঞ্জাবে খালিস্তান আন্দোলনের সময় রাষ্ট্রীয় একাত্মতা কায়েম রাখার নিমিত্ত তিন শতাধিক সন্ত-মহাত্মার 'সন্তযাত্রা', পরবর্তীকালে প্রতি প্রদেশে সন্তযাত্রা, প্রথম ও দ্বিতীয় একাত্মতা যাত্রা, অমরনাথ যাত্রা, গঙ্গাসংরক্ষণ জাগরণ যাত্রা, বিশ্ব-মঙ্গল গো-গ্রাম যাত্রা, শ্রীরামসেতু বাঁচাও অভিযান, শ্রীরামজন্মভূমি অযোধ্যা আন্দোলন, শ্রীকৃষ্ণজন্মভূমি ও কাশীবিশ্বনাথ পুনরুদ্ধার আন্দোলন ছাড়াও প্রাদেশিক স্তরে ও স্থানীয় ভাবে নানান আন্দোলন ও জাগরণের ব্যাপক কর্মসূচি পরিষদ পরিচালিত

করেছে--- সন্ত-মহাত্মাদেরই অগ্রণী ভূমিকায়। শ্রীরামকথা, শ্রীকৃষ্ণকথা ও শিবপুরাণের মাধ্যমে গ্রামে, বনে-জঙ্গলে হাজার হাজার স্থানে শ্রীহরিকথা যোজনার মাধ্যমে যে জাগরণের কাজ চলছে তাতে সন্তদের ভূমিকা অনবদ্য।

৫০ হাজারের অধিক গ্রামে একল বিদ্যালয়ের বিশাল কর্মযজ্ঞ চলছে।



মোহন্ত রামচন্দ্র পরমহংস



মোহন্ত নিত্যগোপাল দাস



গিরিরাজ কিশোর

সাক্ষরতার সংকল্প নিয়ে শত শত স্থানে লক্ষ লক্ষ দেশবাসী (ধর্মান্তরকরণের শিকার) নিজ হিন্দুধর্মে আবার প্রত্যাবর্তন করছেন। এসবের পেছনে প্রেরণাবিন্দু হচ্ছে পূজ্য সন্তমহাত্মা।

গীতা, গঙ্গা, গায়ত্রী, সীতা-সিন্ধু-সাবিত্রী

ধেণুমাতা-হিমালয়- ভারতী, দেবভাষা

সংস্কৃত যত্র—তত্র হিন্দু সংস্কৃতি।

—এই সংস্কৃতির যেখানেই আরাধনা, সেখানেই সন্তকুলের বরদহস্ত। শুধুমাত্র নিজ সম্প্রদায়, আশ্রম, মঠ-মন্দির নয়, আজ ওই সব পরিধির বাইরে বেরিয়ে নিজ আসনের গরিমার উপরে উঠে তুচ্ছ সংকীর্ণতার বেড়া ভেঙে তাঁরা দু-বাহু বাড়িয়ে উদাত্ত কণ্ঠে ডাক দিতে পেরেছেন— "হিন্দবঃ সোদরা সর্বে— ন হিন্দুর্পতিতো ভবেৎ। মম মন্ত্র হিন্দু রক্ষা মম মন্ত্র সমানতা"।। সমস্ত হিন্দুই সহোদর, কোনো হিন্দুই পতিত নয়। হিন্দুরক্ষা ও সমরসতাই আমার মূলমন্ত্র।

পশ্চিমবঙ্গেও দীর্ঘ কয়েক দশক ধরে একটি শক্তিশালী মার্গদর্শক মণ্ডলীর বিভিন্ন মত-পথ, সম্প্রদায়ের শত শত সন্ত মহাত্মারা নিজ গণ্ডী, গরিমা, ক্লান্তি, বয়স, অসুস্থতা সব কিছু ভুলে গিয়ে সব সময় পরিষদের বহুবিধ কর্মসূচিতে এগিয়ে আসছেন। পরিষদ ছাড়াও অন্য যে কোনো ধর্মীয় আয়োজনে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে এগিয়ে এসেছেন শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন, ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ, ইসকন, গৌড়ীয় মঠ, মহাউদ্ধারণ মঠ, আদ্যাপীঠ, দক্ষিণেশ্বর ও কালীঘাট মন্দির, প্রভু জগদ্বন্ধু আশ্রম, প্রেমমন্দির, ডুমুরদহ উত্তমাশ্রম, আলমবাজার মঠ, নবদ্বীপধাম, চিন্ময় মিশন, গায়ত্রী পরিবার, আর্যসমাজ, শুকচর, মায়াপুর, নীমপীঠ, তারাপীঠ, গঙ্গাসাগর-সহ আরও অনেক ধর্মীয় স্থানের পূজ্য সন্ত মহাত্মাগণ। স্থানাভাবে আরও অনেক ধর্মীয় স্থান ও প্রবুদ্ধ সন্ত মহাত্মাগণের নাম উল্লেখ করা সম্ভব হলো না।

পরিশেষে, বিশাল হিন্দু সমাজকে সশক্ত ও সামর্থ্য করার যে সংকল্প নিয়ে অনেক সংগঠন অনেকভাবে দিবারাত্রি কাজ করে যাচ্ছে, তাদের সকলেরই শীর্ষদেশে বিরাজ করছেন— এই পূজ্যপাদ সন্তবৃন্দ। যাঁরা সত্যিকারের জীবন রচনাতে ব্রতী আছেন এই মন্ত্র নিয়ে— "আত্মানং মোক্ষার্থ জগদ্ধিতায় চঃ।"

জাতীয়তাবাদী বাংলা
সংবাদ সাপ্তাহিক
স্বস্তিকা
পড়ুন ও পড়ান

সাবধান নকল তালমিছরি কিনে ঠকবেন না

স্বদেশী আন্দোলনের যুগেও
বাংলার ঘরে ঘরে ছিল
বিশ্বস্ত একটাই নাম



চির পরিচিত
দুলালের®
তালমিছরি

আজও তার জনপ্রিয়তা অক্ষুণ্ণ বাংলার প্রতিটি ঘরেই।
সাধারণ অল্প সর্দি - কাশিতে দুলালের তালমিছরি চুষে খাওয়াই যথেষ্ট। আর সর্দি - কাশি বেশী হলে একটা লবঙ্গ ও একটু আদা সহ দুলালের তালমিছরি এক সঙ্গে ফুটিয়ে চায়ের মতন দু' বার খান — দারুণ কাজ দেবে।

ভারত সরকারের R চিহ্ন দেখে তবেই কিনুন

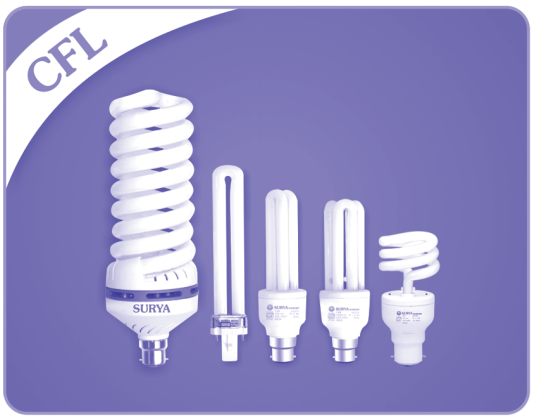
দুলালের তালমিছরি — সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক উপাদানে তৈরী

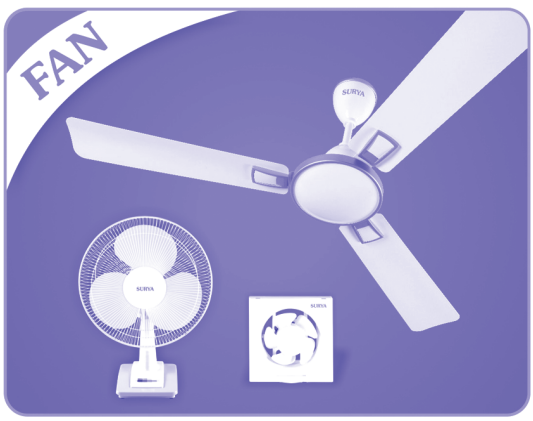
দুলালের তালমিছরি ৪, দত্তপাড়া লেন, কলকাতা - ৭০০ ০০৬, ফোন - ২২১৮ ৫৬৭৩, ২২১৮ ০৫৪৩

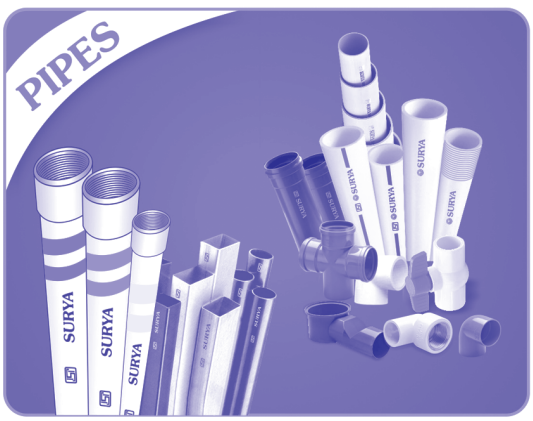
SURYA

EVERY CITY EVERY HOME









The biggest Indian MultinatiOnal SURYA showcases the best of lighting solutions, unmatched range of fans and quality pipes that touches the live of people from EVERY CITY EVERY HOME

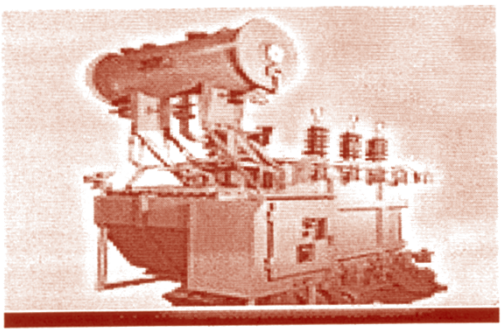


SURYA ROSHNI LIMITED

Padma Tower-1, Rajendra Place, New Delhi-110008 (INDIA)
Tel. : +91-11-25810093-96 Fax : +91-11-25789560
Email : consumercare@sroshni.com Website : www.surya.co.in

With Best Compliments From

AN ISO-9001
CERTIFIED
COMPANY



EIU EIU

East India Udyog Limited

145, G.T. ROAD, SAHIBABAD
GHAZIABAD - 210 005 (UP)

Phone : [0120] 4105890
e-mail : eiulgbd@vsnl.com
eiulgbd@rediffmail.com
URL : www.eastindiaudyog.com

Manufacturers of :
"ETS" MAKE POWER & DISTRIBUTION
TRANSFORMERS UPTO 15 MVA & 33 KV CLASS

কোটিপতি হোন!

নিজের স্বপ্ন গুলোকে বাস্তবে রূপ দিন

মিউচুয়াল ফাণ্ডে **SIP করুন**

১০০০ টাকা প্রতি মাসে যারা ১৯৯৫ সাল থেকে ২০১৩ পর্যন্ত SIP-তে নিয়মিত বিনিয়োগ করেছেন তাদের প্রত্যেকের ফান্ড ভ্যালু বর্তমানে ৩২ লাখ টাকা।

যোগাযোগ ঃ দেবাশিষ দীর্ঘাঙ্গী, শুভাশিষ দীর্ঘাঙ্গী

DRS INVESTMENT

Mutual Fund | Insurance | Fixed Deposit | Bond

9830372090
9433359382

মিউচুয়াল ফান্ডে বিনিয়োগ বাজারের ঝুঁকির শর্তাধীন। যোজনা সংশ্লিষ্ট সমস্ত নথি যত্ন সহকারে পড়ুন।

বেঙ্গল সামুই ফ্যাক্টরী

নিউ কমল ব্রাণ্ডের

ভাজা সামুই ব্যবহার করুন

মাত্র দুই মিনিটে ক্ষীর তৈরী হয়।

শান্তিনিকেতন, বোলপুর,

মোবাইল - ৯২৩২৪০৯০৮৫

যোগ চিকিৎসা

যে কোনও শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধ তিতে মাত্র ৮১০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনষ্টিটিউট অব কালচার, যৌগিক কলেজ অ্যাণ্ড নার্সিং হোম,

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯ ফোন ঃ ২৪৬৪-৬৪৬৪, ২৪৬৩-৭২১৩ যৌগিক নার্সিংহোম (২০টা শয্যা) ঃ ২নং ঘোষপাড়া, নাজিরবাগান, ঢাকুরিয়া, কলকাতা-৭০০ ০৭৮ ফোন ঃ ২৪১৫-৩৫৬৬

Ori Plast



P.V.C. Threaded Pipes. For deep Tubewell & general sanitation. Substitutes to conventionnal G.I. Pipes

Authrorised Distributor :

NATIONAL PIPE & SANITERY STORES

54, N. S. Road. Kolkata-700001. Ph. : 2210-5831, 2210-5833
3, Jadu Nath Dey Road, Kolkata-12, Ph. 2215-6804, Fax : 2212-2803

PARTHA SARATHI CERAMICS

4, College St. Kalkata-700012. Ph. :2241-6413/5986

With Best Compliments from -

A Well Wisher

Swastika Weekly, RNI No. 5257/57 Postal Registration No. Kol. RMS/48/2013-2015
22 December - 2014

EDEN.
Honest Promises. Honest Performances.

EDEN
RICHMOND PARK

10 BLOCKS

AT ATLAS MORE, NEAR NARENDRAPUR R.K. MISSION, GARIA

300 VICTORIAN RESIDENCES





Hyde Park - Landscaped Gardens | ***Windsor Hall*** - AC Community Hall
Theatre Royale - Home Theatre Room | Swimming Pool | Gymnasium & Spa
Children's Play Pen | Billiards Room | Games Room | Cards Room | **24 hrs** Security



Location map



www.edengroup.in
84500 84500 | 98300 63776

দাম : ১০.০০ টাকা